সোঁদামাটি

বর্ষা সংখ্যা ১৪২৩

সোঁদামাটি

তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

বর্ষা সংখ্যা ১৪২৩

(৩য় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা)

সম্পাদক

দীননাথ মণ্ডল

প্রচ্ছদ : সুজয় মণ্ডল

বই বাঁধাই : সাদিক ইকবাল

অলংকরণ ছবি : সৌজন্যে অন্তর্জাল

যোগাযোগ

সোঁদামাটি সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক দীননাথ মণ্ডল,

স্টার প্রিন্টার্স, বড়ুয়া, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ,

পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭৪২১৮৯

Website: *www.sondamati.com*

www.sondamati.in

www.facebook.com/sondamati

Email: *sondamati@gmail.com*

Mobile & WhatsApp: *9 153126613*

শুভ উদ্বোধন

সোঁদামাটি : শারদ সংখ্যা ১৪২২
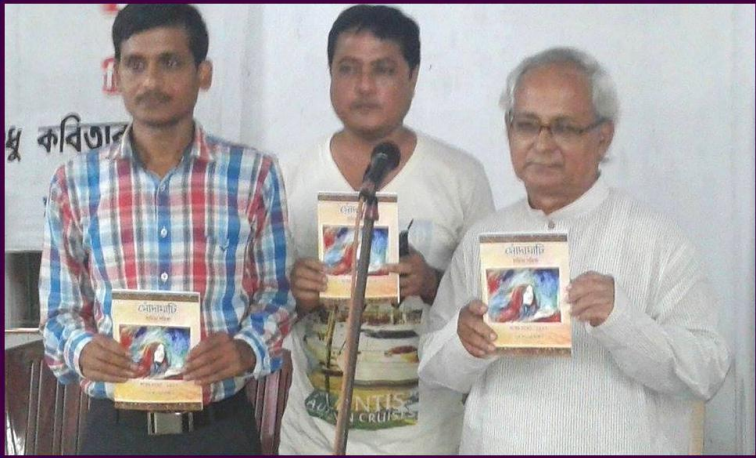
সম্পাদক- দীননাথ মণ্ডল, কবি- কবিরুল ইসলাম কঙ্ক, কবি- সন্দীপ বিশ্বাস (বামদিক থেকে)

সম্পাদকীয়

আর একটা বর্ষাকাল। বৃষ্টির স্নিগ্ধ শীতলতা শুকিয়ে যাওয়া গাছের শীর্ণতাকে আবেশ বুলিয়ে আনে সবুজের জোয়ার। প্রকৃতিও খানিক হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। চাতক তার তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয় খুশিমতো। সমাজে ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, মানবতা আজ বিপথগামী। সংকীর্ণ চর্চার কালি মেখে পাণ্ডিত্যের ডিগ্রি নিতে ব্যস্ত। বিশ্বজুড়ে ক্রমশ জমে উঠছে হিংসা ও আতঙ্কের বারুদস্তূপ। বিভেদের বেড়াজালে বন্দি মানুষ চেয়ে আছে দু-দণ্ড শান্তি ও সুখের আশায়। সাহিত্যের কলম সমাজকে প্রতিফলিত করে যায় নীরবে। ফুটপাথে জীর্ণ বস্ত্রে শীর্ণ শিশু অভুক্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাউল তাঁর ছেঁড়া একতারায় সুর তোলে কণ্ঠে– 'আল্লা মেঘ দে পানি দে'। নির্ঝর বারির চুয়ে পরা ধারায় চোখ রেখে উদারমন স্বপ্ন দেখে- 'একদিন, পৃথিবী আবার শান্ত হবে...'

পেয়েছি, অজস্র শিল্পসুন্দর ব্যক্তিত্বের সুষমা। মূল্যবান লেখা দিয়ে পত্রিকাকে ধন্য করেছেন যারা এবং পত্রিকা প্রকাশে যাদের অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছি- তাদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দীননাথ মণ্ডল
সম্পাদক
সোঁদামাটি
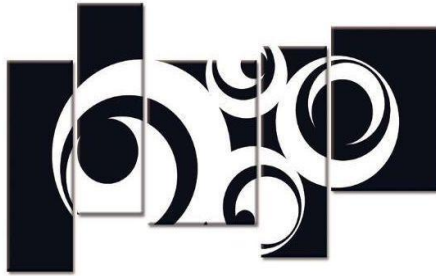
সোঁদামাটি

বর্ষা সংখ্যা ১৪২৩, ৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা

সূচিপত্র

‘সোঁদামাটি’ : ২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকার নাম ‘সোঁদামাটি’। নামটি বেশ। জ্যৈষ্ঠের খরতাপে রুখা-শুখা মাটিতে প্রথম ধারাপাতে সিক্ত মাটির গন্ধ কার না ভালো লাগে ! এখন অবশ্য কলকাতা ও বড় শহরের কংকীটের জঙ্গলে মাটি নেই, সোঁদামাটির গন্ধও নেই। সে গন্ধ পেতে হলে যেতে হলে যেতে হবে গ্রাম বাংলায়। নিঃশ্বাসে বারুদগন্ধে’র পাশে মাটির গন্ধ বিলি করবে পত্রিকাটি এমন প্রত্যাশা পাঠকের থাকবে – সংশয় নেই। পত্রিকার অতি সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় সে কথা বলেছেনও পত্রিকা সম্পাদক “নবদিগন্তের আশায় ‘সোঁদামাটি’ তার গন্ধ পৌঁছে দিতে চায় আবিশ্ব বাঙালির হৃদয়ে”।

পত্রিকাটির প্রকাশস্থান মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। কিন্তু সে তো একটা ভৌগোলিক সীমানা মাত্র। সাহিত্য তো কোনো ভৌগোলিক সীমানায় আটকে থাকে না। তাই পত্রিকার লেখকসূচিতে ঠাঁই পেয়েছে ওপার বাংলা এবং এপার বাংলার কলকাতাসহ নয়টি জেলার প্রতিনিধি। মোটামুটি ভব্য কলেবরের পত্রিকায় স্থান পেয়েছে ৩৫টি কবিতা, ৮টি ছড়া একটি প্রবন্ধ ও একটি ছোট গদ্য। অন্তর্জালের সৌজন্যে পত্রিকার লেখকসূচির অনেকের লেখার সঙ্গেই আমি পরিচিত। তাদের অনেক লেখাই আমি পড়েছি। সেই জায়গা থেকে বলবো এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাতেও তাঁরা নিজেদের সুনাম বজায় রেখেছেন। সুজয় মন্ডল অঙ্কিত প্রচ্ছদটি বেশ আকর্ষণীয়।

যাদের লেখার সঙ্গে নতুন পরিচয় হল তাদের মধ্যে তিনটি কবিতা আমাকে টানলো। তুষার মুখোপাধ্যায়ের ‘দুগগা ঠাকুর’, সঙ্গীতময় দাসের ‘বাইশের বিকিকিনি’, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের ‘প্রার্থনা’ ও কবিরুল ইসলাম কঙ্ক’র ছড়া ‘নেই নেই নেই’। পাবলো শাহির কবিতা কিছু পড়া আছে। এবার তাঁর গদ্য ‘অযৌক্তিক অধিবিদ্যা মূলত কবির মাতৃভাষা’ পড়ে বেশ ভালো লাগলো।

পণ্যায়নের প্রবল দাপটে, আদর্শহীনতার এই সময়ে একটা ছোট পত্রিকার টিকে থাকা খুব, খুব কঠিন। আশা করবো দীননাথরা ‘সোঁদামাটি’ প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে, হারিয়ে যাবে না। সম্পাদক ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আমার অভিনন্দন।

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

কবিতা

পয়মন্তী

স্বপন ব্যানার্জী পূর্ণপাত্র

কতকাল হারিয়ে গিয়েছ তুমি
ফিরানো সেই ফটো দেওয়ালে রয়েছে ঝুলে,
অযতনে ধুলা ধুসরিত কাচে ঢাকা
ফ্রেমে।
অশক্ত দুর্বল হাত পায় না নাগাল,
ভুগছি বিপন্ন বিস্ময় এক রোগে।
শুধু আমি নই একা, জীবনানন্দ আরও অনেকে --
বলবো তোমাকে যদি পাই দেখা ।
সব আছে কিছু নাই কারে যেন
খুঁজি তাই, হয়তো তোমাকে !
হয়তো সবুজে ঘেরা ছোট সেই গ্রাম --
ঘরের দাওয়ায় বসে চাল বাছো তুমি,
বৌকথা পাখি ডাকে আমের ডালে,
হিজলের ডালে নাচে দোয়েল কোয়েল।
কথা কিছু নয়, ঝিমায়ে পড়েছে সারাটা
দুপুর।
আড়চোখে চেয়ে দেখো রয়েছি
দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধরে

সামনের বৈঠকখানায়

এম এ আলম

সামনের বৈঠকখানায় বসেছিলাম,
দেখলাম অনেক মেঘের ঘনঘটা আকাশে।
চড়াই পাখিটাও ভিজে বসে গ্রিলে,
আকাশ থেকে ঝরে বৃষ্টি।
পথে পথে কলকল জলস্রোত-
যেন সব ব্যস্তময়তার সাক্ষ্য দেয়,
আকাশ-মৃত্তিকা-ভুবন।

যুক্তি আর দৃষ্টিগ্রাহ্যে
কোনক্রমে একজন মাত্র দ্রষ্টা।
সব আসে আর যায়,
অনেক ভেবে মহা আবেগে দেখি-
সামনের বৈঠকখানায়
সময় কাটে বৈকি।

এক বিন্দু জীবন

ঋষি

যে কাউকে
নিদিষ্ট শিলালিপিতে ফটিকের কল্পনা অহল্যার বুক
অভ্যাসে জীবন।
সারা বিশ্ব যদি মাদার টেরিসা হয়ে যায়
সামনের অচলায়তন অনাথ শিশুটার মুখে হাসি
চোখের জলে পাথর ভাঙ্গে অহল্যা হাসে।

যে কাউকে
একটা জীবনে পরম প্রিয় ঈশ্বর করা যায়।
জেট, ধর্ম, অভিন্ন হৃদয়ের নগ্ন ভিখারিনীর বুকে অর্ধেক চাঁদ
জ্যোৎস্না সারা পৃথিবীতে,
গভীরে উত্তরণ মানুষ আর মাদার টেরিসা বোধ।
যে কাউকে
কোনো শ্রমিকের ঘামে যদি একটা পৃথিবী গড়া যায়
মৌচাকের গভীরে সুখী মৌমাছি সংসার।
মধু গড়িয়ে নামে
মিষ্টি কোন্নো শৈশবে কন্যা ভ্রুণ
হামাগুড়ি দিয়ে অহল্যা সময়ের কাছে।

যে কাউকে
নিদিষ্ট সময়ে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার প্রতিবাদ সময়ের নর্দমাকে
অভ্যাসে শিরদাঁড়া।
সারা বিশ্ব যদি মাদার টেরিসার মতন হাসে
কালি মাখা শৈশবের হাতে বর্ণপরিচয়
চোখের সামনে গড়িয়ে নামে এক বিন্দু জীবন অহল্যার।

২১ শে ফেব্রুয়ারি স্মরণে

মনিরুদ্দিন খান

ফি বছরে ফেব্রুয়ারির
একুশ তারিখ এলে
বুকের ভিতর ধিকিধিকি
তুষের আগুন জ্বলে।
শিরায় শিরায় রক্ত নাচে
দারুণ শিহরণ,
আকাশ বাতাস থরথরিয়ে
কাঁপে হৃদয়বন।
বাজবিজলি চমকে ওঠে-
আঁধার মেঘের কোলে,
মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে
শয়তানেরা আসে সদলবলে।
আঁতকে উঠে হঠাৎ দেখি
ফেরেস্তারা এসে
সালাম, রফিক, বরকত বেশে
ফুলের মত হাসে।
বাংলা মায়ের শহিদ যারা
আজও অমলিন,
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
বাজায় অভয় বীন।

জিন্নতউন্নেসা

সেলিম জাহাঙ্গির

হ্যাঁ, মানুষের কলজে। না, কলজেখাকি
আজিমুন্নেসাকে চিনি না; সে হয়তো
সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ে, যে
রাক্ষসপুরী সেখানকার কোনও
মুর্শিদকুলির কন্যা-টন্যা হবে।
মুর্শিদাবাদপুরীর জিন্নতউন্নেসা
বা আজমতউন্নেসা-- তিনি তো ধর্ম-
পরায়ণা। নিঃসঙ্গতার বিষে নীল-
আকাশের বিজলি। স্বামী সুজাউদ্দিনের
চরিত্রের কালো মেঘের প্রতিবাদ ...

না, কলজেখাকি আজমতউন্নেসাকে
চিনি না। সে হয়তো পাতালপুরীর কোনও
মুর্শিদকুলির কন্যা-টন্যা হবে।
নবাবপুরীর আজমতউন্নেসা-- তিনি তো
বিচক্ষণতার ঝরনাধারা। স্বামীর
বিরুদ্ধে পুত্র সরফরাজের মাথা
থেকে ধুয়ে দেন বিষ। তিনি তো মহানু-
ভব রাজকন্যা, মুক্তোর মতো কুড়িয়ে
নেন স্বামীর ক্ষমাপ্রার্থনা।

তাঁর সুখ
থেঁতলে অবশেষে তাঁকে রক্তাক্ত
করে স্বামীর মৃত্যু... পুত্রনিধন...
আলিবর্দির যথাযোগ্য সম্মান তাই কি
হয়ে উঠেছিল স্বর্ণোজ্জ্বল জুতো দান?

কথা

কৌশিক বিশ্বাস

কথাগুলো মেঘ হয়েছিল কাল
উড়ে গিয়েছিল তোর ঠিকানা ধরে,
এ পথ, সে পথ
গোটা আকাশ জুড়ে।

তোর আঙুল তখনও
নরম রোদ মাখছে, শিশির ভেজা ঘাসে;
স্বপ্ন দেখা রূপছায়াদের দলে,
আনমনা চোখ আকাশ পাড়ে মেশে।

আমার কথা হিমেল হয়ে ঝরে
ছুঁয়ে দেখে তোর, ঠোঁটের পেলব হাসি
কথাগুলো মেঘ হয়েছিল কাল
শুধু বলতে, আজও তোকেই ...
শুধু তোকেই ভালবাসি।

পাখি-বিকেল

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

কতবার বাধ্য তির হাতে ছুটে গেছি
সুরোভিত উদ্যানের খোঁজে.......,
কোথায় পাখি ? উপবন জুড়ে পড়ে আছে --
প্রাক্তন রুমাল

পাখি শিকার হল না
কেবল তুমুল বাজিয়ে চলে
গেলাম, আমাদের প্রাক্তন বিকেলের খোঁজে

প্রাণ মোহনা

দীপঙ্কর বেরা

কুড়িয়ে বাড়িয়ে দুঃখ-দিনের
যত সুখকণা
উৎসবের জোয়ার তুলে
ভাসাই উন্মাদনা,
খরচের টানাপোড়েন
হৃদয় খুশির খাজানা
মিটিয়ে যায় আবদার আর
আদরের বাহানা।
পোষাক আশাক ঘর সাজান
নতুন নতুন চাই
এই সিজিনে মুখের হাসি
উপভোগ করে যাই।
যে দিকে যত আলো আর
উচ্ছ্বাস মন মানেনা
গান বাজিয়ে কোমর দোলায়
নাচ কিনা জানেনা;
অত জানার দরকার কি ?
প্রাণ ভরে খায় সুখকণা
উৎসব তাই প্রাণে প্রাণে
মিলনের মোহনা ।

যাচনা

সঞ্জয় আচার্য

গন্ধ মাখা বকুল বনে মুগ্ধ পলাশ কলি
ক্লান্ত পথিক গুনগুনিয়ে দিচ্ছে প্রেমাঞ্জলি ।

মধুর লোভে আসছে উড়ে লক্ষ্মীছাড়ার দল
কনকচাঁপা, অশোক ঘিরে নৃত্য, কোলাহল।

দূরের আকাশ আবীর মেখে স্থির দাঁড়িয়ে রয়
নেই পাশে যার প্রিয়তমা, তার কি জ্বালা সয় ?

ইষ্টিকুটুম ডাক দিয়ে যায়- পাখি তো নয় পাজি
তিতাস বুকে ডুব দিয়েছে প্রেমযমুনার মাঝি।

শুকনো পাতার পাঁয়তারাতে জাগছে মনে ভ্রম
এপার-ওপার হয়ে গেলে পণ্ড হবে শ্রম।

পথ হারানোর পরিক্রমায় আপনজনের টানে
পথিক বাউল গানে গেয়ে যায় ভুবনডাঙার পানে।

আসবে যাবে ফুল্ল ফাগুন কাঁদবে মন ও প্রাণ
তোমার মনের ফাগুন যেন না হয় অবসান।

আমার মন বাঁশি বাজুক এই কাঙাল দেশে

রাজকুমার শেখ

ওরাই আমার কেড়ে নিয়েছিল ভোরের আজান ধ্বনি
মিনারের মাথা ভেঙে দিয়েছিল
তবু দেশ ছাড়তে পারিনি
কেননা এই মাটির বুকে জন্ম দিয়েছিল আমার মা
আমি এখানেই থাকতে চাই
যেহেতু আমার বাড়ি থেকে মন্দির দেখা যায়
মসজিদ-গীর্জা দেখা যায়
এমন কি কখনও কখনও বুকের বাঁশি খুলে
দিয়ে বলি, কৃষ্ণ, বাঁশি বাজাও
এ দেশ বড়ই কাঙাল হয়ে গেছে
একটু ভালোবাসবার...

মাটি

দেবব্রত সরকার

মাটি, মাটি, মাটি
তুই সকলের খাঁটি
কেন জানিস তুই
চষা জমি- ভুঁই
সোনা ফলে ছুঁলে
মধু ফলে ফুলে
দেয় সুখের গদি
মাটি থাকে যদি।

স্পন্দন

খুসবু আহম্মেদ

সন্ধ্যাশেষে নিশার গন্ধে তোমার ছায়া,
আঁধার মেঘে বসে অপেক্ষায়
সভ্যতার স্পন্দন বুকে বয়ে
গুণে যাচ্ছি শেষ তারা।

গোপনে আলোড়ন তুলছে তুফান,
ইচ্ছার দাপট অন্তহীন;
তবু হৃদয় খাচ্ছে হোঁচট,
পারি না ফেটে পড়তে উচ্ছাসে,
আগের মতো আবেগে ঝাঁপাতে।

এলোমেলো ধুলোবালি উড়ছে বাতাসে
পুড়ে যায় আমাদের প্রণয়
তবু তোমার নির্বিকার উচ্চারণ।
ঠোঁট ছুয়ে গেলো বিবর্ণ পাপড়ি
আঁচল ছুয়ে শুধু স্পন্দন,
ফুরিয়ে গেলে জীবনমধুর শিশিটা।

স্মৃতিরা আজ বড়ই ক্ষীন
কাঙালের বেশে যাচ্ছে দিন,
তবুও তোমার মাঝে হই বিলীন,
নতুন করে চিনবো অন্ধাকার
সর্বনাশ রাত্রির পরের ভোর,
প্রকাশ্য দর্পনে আমাদের প্রণয়।

কালচিত্র

সুদীপ্ত বিশ্বাস

জীবনটা তো গেল প্রতীক্ষায়
অঢেল সময় নেই কারও, ঘন্টা বাজে
কারা যেন ডাকে, আয় আয় ...

পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছি গাছ
সহস্র স্রোতের টানে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে
তুমি কি নদী হবে না আজ?

নদী হও, হও নদী, বয়ে যাও
অজস্র ধারায়। দুকূল ভাসিয়ে নদী
আমাকে পাগল করে দাও।

ভেসে যাওয়া? সেটাও সার্থক।
শ্মশান যাত্রীরা চলে গেলে, পাখি ডাকে -
'গৃহস্থের খোকা হোক'।

প্রাচীন গ্রন্থালয়

সুপর্ণা দাস

বিষয় নেই এগিয়ে যাওয়ার
চার পাতার অন্তরালে-
খুঁজতে গিয়ে দেখি সমাধি।
সমাধির ভস্মে আগুনের গাঢ় লাল রঙে,
দগ্ধশেষ তার প্রতিচ্ছবি...
প্রতিচ্ছবিতে এক ভাসানো কালো রঙ
দূর থেকে দ্রষ্টব্য যেন কালো ছায়া...
ভাসমান কালো ছায়া মধ্যরাতে রপ্ত করে
নিয়মিত যাত্রাপথে ঢুকে এক সিন্ধুকে
সিন্ধুকের কালিমায় গ্রন্থালয়ের বৃত্তপাকে
শীতল হাওয়ার টানে যাচ্ছি চলে...!

বিদঘুটে আওয়াজ আর আর্তনাদ
গোটা চারতলা জুড়ে
অস্থির সরবে বলতে চায় "রিক্তভাঙা অশ্রু" দে...
অনন্তকালের খোঁজ
বইটি আমার চাই
বাকি পরা শেষ আরোও চারটি পাতা
আর সেই লকেটের মধ্যে আমার নাম...

আমি কি জানি?
জানার কি কথা ?
মুর্চ্ছমান শরীরের
রক্তাক্ত হিয়ার আনাচে কানাচে
দুর্বিসহ প্রশ্নচিহ্ন...
অলিখিত লেখার খোঁজে
রহস্যের অন্তরালে
নিভৃত কুয়াশায় ঢাকা
এক কঠিন পথ
বাস্তব...।

রুপান্তর

দেবাশীষ মন্ডল

বড় অসময় ছিল সব
স্তব্ধতা
দীর্ঘশ্বাস
অন্ধকার। নাহ্....
সামাজিক কিংবা অসামাজিক
কোনোটাই আমার করায়ত্ত ছিলো না,
মানুষ এবং মানবিকতায় ছিল
অনিবার্য কিছু প্রশ্ন,
গালে হাত দিয়ে তাই বরাবর
মৃত্যুকে উপভোগ করতে চেয়েছি।
(বেদুইন হাওয়ায় রুপান্তর)
চড়া রোদ ম্লান হয়ে আসে সানগ্লাসে,
উত্তাপ চুঁইয়ে পড়ে
টোল খাওয়া গালে,
প্রতিটি অক্ষর স্পর্শ করে থাকে
মাখো মাখো প্রেম
বেঁচে থাক,
আমার দিনান্তের মেঘ
একপশলা বৃষ্টি........

বিলাসী হাওয়ার চাদরে

লতিফা ইয়াসমিন সুইটি

আড়ষ্ট রাতের বুক চিরে
ছুটে আসে নির্ঘুম ঠান্ডা হাওয়া
মধ্যলোকের কিনারা থৈ থৈ করছে
স্নেহহীন স্নেহের বন্যায়
আমি থেমে যাই দু চোখের আশা নিয়ে
থেমে যাই ঝাড়বাতির সন্ধ্যা দেখে।
কখনো বস্ত্রহীন শিশুর চাউনি দেখে
শিউরে উঠে ভাবি
এ আমার অথর্ব সময় সত্ত্বা।
কখনোবা অক্ষম সময়েরা মিউমিউ স্বরে
সটকে পড়ে লোমশ ওমে।
কি নির্মম বিলাসিতার চাদরে
ঢেকে থাকে পৃথিবীর স্বত্ত্বা আমার।
মুখ ঢেকে রাখি মুখোশের আড়ালে।
কেন পারি না দিতে
ভালবাসার উষ্ণ হাওয়া।

মৃতবৎ

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃতবৎ পড়েছিল সরীসৃপ-
ঘাপটি মেরে সহিকারাকাঙ্ক্ষায় বা
মৃত্যুপেক্ষায় জিরোচ্ছিল কিছুক্ষণ।
অজানা আতঙ্কে সরে সরে যাচ্ছে মানুষ,
এক কোণে রয়ে যায় বুকে হাঁটা জীব।
সময় বয়ে চলে বৃত্তাকার পথে
জীবন চলে যায় এঁকে বেঁকে হেঁটে।
আচমকা শান্ত নীড়ে পড়ে ঢিল
টিকটিকি করে ওঠে কিলবিল—
যেভাবে বুকে চিৎ পড়ে ছিল
হঠাৎই খোঁচা খেল, ছিটকে লুকোল।
এসেছিল বুকে ভর, শরীরের সব ভার
তুলে নিয়ে ফিরে যায় আধাঁরের আশ্রয়ে।

নিভৃতে

জৈদুল সেখ

অনেক বছর আগেই স্বপ্ন থেকে দূরে এসেছি,
যন্ত্রণাকে পিষে পিষে নির্বাক কঙ্কাল সাথে কথা বলে দেখেছি
শ্যামলীর মুখে ঘাতকদের ক্ষতচিহ্ন,
দুর্গন্ধ মাখা কোনো আস্তাকুরে প্রস্রাব করে বলে -
'হে সমাজ আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না,
আমাকে শুধু বাঁচাতে দাও!'
তখন যেন আমার কঙ্কালও সবাক হতে চেয়ে বলে -
আমি যে বেঁচে থেকেও মরে গেছি !
ভালবাসা যে শোষকের হাতিয়ার,
এ সমাজে ভিক্ষা চেয়ো না,
পারলে ছিনিয়ে নিতে শিখো !
তাতে হয়তো নিস্বার্থভাবে নিসর্গ বেঁচে যাবে !
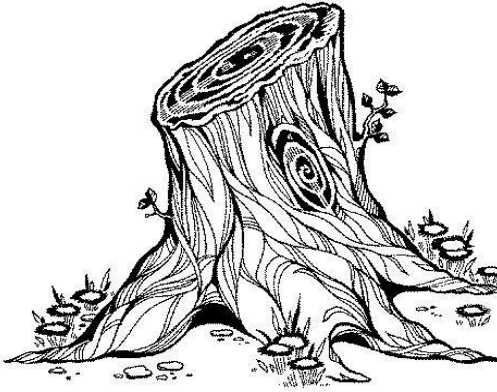
প্রতীক্ষা

অর্চনা মিত্র

অনেক ভালোবেসে
অনেক আশা নিয়ে এসেছি।
তোমার কাছেই ফিরে আসবো,
তুমি কী সেই আগের মতোই আছো, না
একটু বদলে গেছো।
অনেক দূরের পথ, সম্মুখে চৈতালী মাঠ,
চাতক পিপাসায় একটু জল চাই।
আমি তো সেই চাতক
হয়েই আছি,
ফাগুন কবে আসবে,
কোকল যবে ডাকবে,
ফুলে ফুলে প্রজাপতি এক হয়ে থাকবে,
সেদিন আবার নতুন করে
তোমার কাছেই ফিরে আসবো।

দুঃসময়

মুরারি

সময়টা বড় দুঃসময়
লগ্নটাও অলুক্ষুনে;
তাই চারিদিকে অ্যাত দ্বন্দ্ব বিবাদ;
প্রতিশোধের নেশা খুনের বদলায়,
বুদ্ধির প্যাচ আর বিলাসিতার ঘোরে-
অন্ধবিমূঢ় বিশ্বটা এখন
কালিয় নাগের ফণার মতো।

তোর শ্রাবণ. ...

নীলাক্ষী চ্যাটার্জী

সেদিন হঠাৎ তুই বলেছিলি তুই নন্দিনীকে
ভালোবাসিস
আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে
বলেছিলি
হয়তো ভেবেছিলি আমি সইতে পারব না. ...
হয়তো জানিস আমি তোকে বড্ড
ভালোবাসি,
হয়তো বুঝিস আমি তোর জন্য সব পারি
ভাঙতে গড়তে, গড়ে আবার ভাঙতে জানি. ..
এ সবই তুই জানিস, আর জানিস বলেই
সেদিন তাকাস নি.....
আমি তোর প্রেম নয়, কিন্তু এক লহমায় আমি
তোর
আমি তোর জীবন নয়, কিন্তু আমার জীবনে
শুধু তুই
আমি তোর পৃথিবী নয়, কিন্তু আমার গোটা
আকাশ তুই
আমি তোর কেউই নয়, কিন্তু আমার
সমস্তটা তুই...
তুই তো আমায় ঠকাসনি, কোনো প্রতারণা
কোথাও নেই
তুই আজও দৃঢ়, আজও সত্যি, আজও সব থেকে
বেশি বিশ্বাসী..
নাই বা হলাম রে তোর বসন্ত, সেটা সেই
অনবদ্য নারী হোক,
আমি তো তোর শ্রাবণ হতে চাই, যেখানে
উথলে উঠবে তোর দুচোখ. ...

ছড়া

বৃষ্টি ভাবনা

পলাশ ব্যানার্জী

ভাব সাগরে বাণ ডেকেছে
কল্পনাতে ঝড়,
কোথা হতে বৃষ্টি এলো
ভাসিয়ে দিলো ঘর।

ঝড় থামতে বৃষ্টি ভেজা
রাস্তা অলিগলি,
ভেবে পাইনা কেমনে লিখি
কেমন করে বলি।

বৃষ্টি ভেজা চিন্তা নিয়ে
শুকনো কাগজ পরে,
শুকনো কাগজ ভিজিয়ে লিখি
ভাবনা যদি ঝরে।

সবটা আজ কল্পনা যে
বাইরে অতি বৃষ্টি,
বৃষ্টি নিয়ে ভাবনা তাই
ছন্নছাড়া সৃষ্টি।

রাতের খবর

নুরজামান শাহ

রাতের আকাশ ঘুমায় দেখি
শান্ত নদীর ঢেউ এঁকে,
চাঁদের আলো বার্তা পাঠায়
আমার নিঝুম গাঁ থেকে।

ঝিলমিলিয়ে লক্ষ তারা
ফোটে আকাশ জুড়ে,
রাত রুপসী বনপরীরা
বেড়াই উড়ে উড়ে।

মন মাতানো বিচিত্র সুর
বাজে পাতার ফাঁকে,
শিশির জলে জোছনা যেন
রূপোর ছবি আঁকে।

চোখের কোণে স্বপ্ন ভাসে
মেঘ ভেসে যায় দূরে,
কুটির ঘরে শুয়ে খোকা
দেখছে দু'চোখ জুড়ে।

উল্টো পুরাণ

যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

তালগাছেতে আম হবে ভাই
নিমগাছেতেই তাল,
চারিদিকেই চামড়া বদল
গাছ বদলায় ছাল।

গাধার গলায় গান শুনি ভাই
বাঘ ধরেছেন সুর,
কতই রকম চলছে নিয়ম
আরও, দেখবো কতদূর !

শিয়াল ভায়ার গজায় ডানা
হাতির মাথায় শিং,
ছাড়পোকাদল মারছে মজা
নাচছে তা ধিন্ ধিন্।

ভাবছি বসে চলবে ক'দিন
এমন সুখের ঘর ?
মুণ্ডুগুলো একই আছে
বদলে গেল ধর।

ভাষার টানে

গার্গী মুখার্জী

ক্যালকাটা হল কোলকাতা আজ
মাতৃভাষার টানে,
মায়ের ভাষা বড়ই খাসা
সবাই সেটা জানে।

দুঃখ সুখে পরম সহায়
ভাষায় মন ভরে,
অন্য ভাষায় বলতে কথা
প্রাণটা হু হু করে।

রফিক জব্বার আর বরকত
স্বাধীন ছিল তারা,
মাতৃভাষায় বলতে কথা
বাধ সাধল কারা?

রক্তে ভেজা রাস্তাঘাট
ঢাকা শহরময়,
প্রাণ দিল কত ভাষাপ্রেমিক
যুব শক্তির জয়।

দিনটি ছিল বাহান্ন সাল
ফেব্রুয়ারি মাস,
একুশ তারিখ দেখল সবাই
ভয়াবহ সেই ত্রাস ।

সেদিন থেকেই ভাষাদিবস
মোদের পালনীয়,
রফিক বরকত আর জব্বার
সবার স্মরণীয় ।

ছোটগল্প

শিউলি

সেখ মোজাম্মিল

বেপরোয়া, তাজালো, ঝাঁকড় ফুলেভরা গাছটা একান্ত বাধ্য হয়ে কাটতে হচ্ছে বলে সবার খুব মন খারাপ। শরতের সকালে শিউলির গন্ধে মঃ! মঃ! করতো এলাকাটা। গাছটা না কাটলেই নয়। একান্নবতী থেকে পৃথগন্ন তিন ভায়ের সংসার ও বাড়ন্ত। বড়ো তরফের বড়ো ছেলের বিয়ে। তার জন্য আলাদা ঘর দরকার।

আজ থেকে দশ বছর আগে এইই শিউলি গাছটা একজন খাস করে লাগিয়েছিল। লাগানোর সময় তার মা আপত্তি করেছিল – হা হতভাগি ! ওটা তো আমাদের ভাগের জায়গা না...! ওটা তো...! মেয়ে বেশ সুন্দর জবাব দিয়েছিল – তাতে কী মা ? ফুল ফুটলে তো সবায় গন্ধ পাবে ! সবার বাড়িরই পূজো হবে।

দৃশ্য দেখে আজ তার মায়ের সেকি আঁছাড়ি-পিছাড়ি কান্না ! আমারও খুব খারাপ লাগছিল। সে আমার একান্ত খেলার সাথি, সহপাঠিনীও ছিল।

আমাদের ঝড়-ঝঞ্জার বয়সে একদিন ও টিউশ্যান পড়তে গিয়ে...অনেক খুঁজে খুঁজেও...! সবাই কুলোটা ভেবে...। সময়ে পলিতে সব চাঁপা পড়ে গ্যাছে। কিন্তু তার মুঠো মুঠো শিউলি... ভুলতে পারিনা আজও।

মহালয়া শুনতে শুনতে মন খারাপের ঘোরে কখন ঘুমিয়ে পড়ে- শিউলি বনে লিকোচুরি খেলছিলাম। হঠাৎ স্ত্রীর প্রবল ধাক্কাতে জেগে উঠি...

-শুনছো পাশের বাড়িতে দারুণ হৈ চৈ... শিউলি ফিরে এসেছে। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছুই বোধগম্য হয় না।

-আরে- ঐ যে – তোমার ভালোবাসা...! ওকে কারা অপহরণ করে পাঁচ বছর আটকে রেখে – পালিয়ে এসেছে...।

আমি আমি লুঙিটাকে কোন রকমে সামলে ছুটে যাই। বুকে শুধু একটাই শঙ্কা – আবাহনেই বিসর্জন হবে না তো !

মাস্টারমশাই

কবিরুল ইসলাম কঙ্ক

পারতপক্ষে কেউ তার সামনে যায় না। খুব দরকার হলে দূর থেকেই কাজ সেরে নেয়। মেজাজি কিংবা বদরাগী বলতে যা বোঝায় তিনি হচ্ছেন তাই। কারও গাফিলতি বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করেন না তিনি। সুতরাং সবাই ত্রস্ত থাকে। তাঁর নজরদারিতে কোথাও পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। তিনি ইংরেজির শিক্ষক অভয়বাবু। ছাত্ররা তো বটেই বাকি শিক্ষকেরা, এমন কী হেডমাস্টারও তাঁকে ভয় করেন। কারণ তাঁর স্পস্টবাদিতা। সত্য এবং ন্যায়কে তিনি সামনে তুলে ধরতে পিছপা হন ন।

ইংরেজি একে বিদেশি ভাষা, তাতে আবার ছেলেপিলেদের অনীহা - দুই মিলে পাঠ-কে দুর্বল করে দেয়শ। ফলে ক্লাসে যে তার প্রতিফলন ঘটবে তা বলাইবাহুল্য। একে ইংরেজির ভয় তার উপরে অভয়বাবুর উপস্থিতি ছাত্রদের ভয় আরও বাড়িয়ে দিত। তারা চেষ্টা করতো অন্য পড়া না হোক ইংরেজি পড়াটা করে আসতে। কারণ তারা জানতো অভয়বাবু একেবারে হৃদয়হীন। পড়া না পারলে হাড়মাস এক জায়গায় রাখবেন না। যারা পড়া একেবারেই পারতো না তারা ক্লাসে থাকতো না। পাশের আমবাগানে ওই পিরিয়ডটা কাটিয়ে আসতো।

ছাত্রদের এই ভয়ের কথা অভিভাবকরা জানতেন। ছাত্রদের মারধর করা আইন বিরুদ্ধ কাজ সেটাও তারা জানেন। কিন্তু ডানপিটে ছেলেগুলোকে শায়েস্তা করার ওষুধ যে অভয়মাস্টার তাতে সন্দেহ নেই। তাই তারা অভয়মাস্টারকে অভয় দেন, "মাস্টার, মেরে হোক ধরে হোক আমার ছেলেটাকে একটু মানুষ করে দেন। "অভিভাবকদের এমন সমর্থন পেয়ে অভয়বাবু হয়ে উঠেছিলেন আরও ভয়ংকর। সুতরাং ছাত্ররা তো বটেই অন্য শিক্ষকেরাও তাঁকে বিশেষ ঘাঁটাতেন না।

এহেন ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই মুষড়ে থাকতেন। কেউ কোনদিন তাঁর কোমল হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। এ নিয়ে চর্চাও কম নয়। সবাই জানেন অভয়বাবুর হৃদয়ে কোমলতা বলে কোনো বস্তু নেই। মাস্টারমশাই নিজেও এব্যাপারটা অনুভব করেন। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর কোনো হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। তিনি যেমন ছিলেন তেমনই রয়ে গেছেন।

সেবার বর্ষায় খুব বৃষ্টি। বৃষ্টির দাপটে ঘর থেকে বের হওয়াই দায়। পথে ঘাটে জল জমে গেছে। মাঠে ধানের শীষটুকু শুধু দেখা যায়। গ্রামের পাশে নদীর বাঁধের অবস্থা ভালো নয়। নদীর জলের তোড়ে বাঁধের কিছু কিছু জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। বাঁধ ভেঙে গেলে বন্যা অবশ্যাম্ভাবী। গ্রামের মানুষজন খুব দুশ্চিন্তায় আছে। বিগত বন্যার অভিজ্ঞতা তাদের মোটেই ভালো না।

অবশেষে সবার আশংকা সত্যি করে বন্যা এল। গ্রামের মানুষদের দুর্দশার শেষ নেই। ক্রমাগত বৃষ্টি বন্যাকে আরও ঘোরালো করে তুললো। মানুষজন সাতদিন ধরে ঘরবন্দি। সবার ঘরেই দেখা দিল খাদ্যাভাব। মজুত খাদ্য শেষ হতেই মানুষেরা জলের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল খাবারের সন্ধানে। বড়রা

খিদে সহ্য করতে পারলেও ছোটরা পারে না। নিজের ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তারা আর ঘরে থাকতে পারল না। কিন্তু বেরিয়েই কিছু হল কই ? আশেপাশের দশ বারোটি গাঁ ভেসে গেছে। সবার ঘরেই এক অবস্থা। গ্রামের যারা একটু অবস্থাপন্ন লোক তাদের ঘরে টাকা আছে কিন্তু খাবার নেই। এ জলের রাজ্যে টাকা দিয়ে কী হবে ? দরকার তো তো খাবার।

গ্রামের মধ্যে অভয়মাস্টারের বাড়ি একটু উঁচু জায়গায়। বন্যার জল সবার বাড়িতে ঢুকলেও মাস্টারের বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। বন্যাতে স্কুল বন্ধ। বাড়িতেও কাজকর্ম কিছু নেই। মাস্টারমশাই দুপুরে বারান্দায় চেয়ারে বসে একটা উপন্যাস পড়ছিলেন। বারান্দার নীচে রাস্তা। রাস্তা এখন জলে ভর্তি। রাস্তার জল ঠেলে আসছিল বারো-চৌদ্দজনের একটি দল। পাংশু তাদের মুখ। বোঝা যাচ্ছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বেরিয়েছিল, সে উদ্দেশ্য তাদের সফল হয়নি। তারা বারান্দার কাছে আসতেই অভয়বাবু জলদগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কী ব্যাপার ? "তারা তাদের কথা বলল। গ্রামের মানুষের দুর্দশার কথা শুনে মাস্টারমশাই একটু ভাবলেন। তার ঘরে যথেষ্ট চাল-ডাল-তেল মজুত আছে। সবই নিজের জমি থেকে আসে। বাড়ির পিছনে সব্জির জমিতেও জল ওঠেনি। তিনি লোকগুলোর উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা এক কাজ করো। চাল ডাল আমার বাড়িতে প্রচুর আছে। সব্জিও পাওয়া যাবে। এখানেই খিচুড়ি রান্না আরম্ভ করো। আর গ্রামে সবার বাড়িতে খবর দাও এখানেই সবাই খেয়ে যাবে। "মাস্টারের কথা শুনে অভুক্ত মানুষগুলো হাতে যেন স্বর্গ পেল। তারা মহানন্দে রান্নার কাজে লেগে পড়ল।

রান্না শেষ হতে বেলা প্রায় গড়িয়ে গেছে। অভয় মাস্টারের বাড়ির উঠোনে প্রায় তিনশো লোকের পাত পড়েছে। মা-বাবাদের সাথে অনেক ছাত্রও আছে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে তারা বেশ আড়ষ্ট। মাস্টারমশাই হাসিমুখে সবার খাওয়াদাওয়া তদারকি করছেন। মাস্টারমশাইয়ের মুখে বিরল হাসি দেখে ছাত্ররা অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে খাচ্ছে। অভয়মাস্টার সবার উদ্দেশ্যে বললেন, "সবাই পেট পুরে খাবেন। যতদিন জল নেমে না যায় আমার বাড়িতে সবার নিমন্ত্রণ রইলো।"

সুখের লাগিয়া

দীননাথ মণ্ডল

সুরোজ ডাইরিটা নিয়ে ঠাঁই বসে আছে মালঞ্চ পার্কে। বিকাল ঘনিয়ে প্রেন্ট আলোয় জ্বলে উঠেছে ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো। চারদিকে বিচিত্র রঙের পোষাকে উষ্ণ ছোঁয়ায় নির্ঝর অবাধ বন্যা।

দু'মাস বাদেই কলেজের পরীক্ষা। ফাস্ট ইয়ারের রেজাল্ট ভালো হয়নি। সময়ের অভাবে প্রিপারেশন এবারেও তেমন নাই। সকালে টিউশনি, দুপুরে কলেজ, সন্ধ্যায় পার্ক, মেসে ফিরে এম টি এস থেকে ফ্রি কল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে ৭টা পেরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর হোয়াটস্ আপের রিং টোন বেজে ওঠে। মেসেজ আসে - "সুরোজ, বাড়িতে লোক এসেছে। কাল কলেজে দেখা হবে।"

গত কয়েকদিন থেকে ঊষাকে একটু অন্যরকম লাগছে। গা ছাড়া ছাড়া ভাব। রাতে মোবাইল এ স্যুইজ অফ করে রাখছে।

কলেজ ঢুকেই ঊষার সঙ্গে সুরোজের পরিচয়। তারপর ঋতুচক্রের রুটিন মাফিক বার্ষিকগতির পরিক্রমা।

রাতে মেসে ফিরে ফোন করে ঊষাকে। স্যুইজ অফ বলছে।

পরদিন কলেজের মাঠে ঊষাকে একান্তে পায়। হাতটা আলতো করে ধরে। ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। শান্ত কণ্ঠে ঊষা বলে- "ওরা নজর রাখছে। আর মোবাইল উইজ করব না।"

ঊষার বাম হাতের তর্জনীতে সোনার আংটিই বাঁধানো সাদা পাথর ঝকঝক করছে। দু'দিন আগে আঙ্গুলটি অনাবৃত ছিল। ঢং ঢং করে তিনটে ঘন্টার আওয়াজ কানে ভেসে এল। ক্লাসে আসে দু'জনেই।

নিরঞ্জনবাবু আর একবার ঝালিয়ে দেবার জন্য আসে পূর্বরাগের ক্লাস। চোখের সামনে ভেসে ওঠে গত কয়েক দিনের টানাপোড়নের আজকের ক্লাসের বৈপরীত্য। স্যারের পূর্বরাগের হিল্লোড় সুরোজের মনে ঝরা পাতার দোলা দেয়। স্মৃতির সরণিতে বেঁয়ে যায় দু'বছরের ময়ূরপুচ্ছ তরীর বেহাল দশা। কানের কাছে ঘুরপাক খায় ডাইরিই লেখা প্রতিশ্রুতি - 'হে চির সখা রহিব দু'জনে জীবনে মরণে এক সাথে এ ধরাধামে।'

মেসে ফিরে ব্যাগটা নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসে সুরোজ। টিকিট কেটে জানলার ধারে বসে। শান্ত বিকেলে রাঙা আলোয় কোলাহল ছেড়ে সবুজ মাঠের বুক চিরে বাস এগিয়ে চলে গ্রামের দিকে। রাস্তার দু'পাশের ক্ষেতের ফসল সোনালি আলোয় চকচক করছে। সারাদিন মাঠে চরে গরুগুলো বাড়ি ফিরছে।

গ্রামের বাস স্ট্যান্ডে নেমেই দেখা হয়ে যায় সুবোধ স্যারের সঙ্গে। সুরোজকে দেখেই স্যার কাছে এগিয়ে আসে।

"স্যার ভালো আছেন?"- সুরোজ জিজ্ঞাসা করে।
"শরীর ভালো যাচ্ছে না। তুমি কেমন আছে? এই বাড়ি ফিরলে? সময় করে একবার বাড়ি এসো সুরজ।"- স্যার বলে।
"আসব স্যার," - কথা বলতে বলতে দু'জনে পাড়ার দিকে এগিয়ে যায়।

বাড়িতে গেলে মা ছেলের হাতে একটা চিঠি দেয়। স্কুলের অভ্যর্থনার নিমন্ত্রণ কপি। ভাল ছাত্রদের প্রতি বছর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ আসে।

পরদিন আর সকলের মতো সুরোজ যায় অনুষ্ঠানে। মঞ্চের সামনে চেয়ার পাতা। এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছে। সাথে তাদের অভিভাবকরাও। তারা পুরস্কার বিতরণের সময় তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে নানা স্বপ্নের কথা বলে। স্মৃতির অন্তর্জালে সুরোজ ক্রমশ ডুব দিতে থাকে। তার বাবাও একদিন এখানে সুরোজকে নিয়ে তার স্বপ্নের কথা জানিয়ে ছিল। স্যাররা সকলে তার প্রশংসা করে ছিল। সুবোধ স্যার বলেছিল "সুরোজ এ গায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে।" ঘেমে যায় শরীর। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পড়তে বসে। এক অজানা সংকেত বিব্রত করে মন। সে যেন সকলের কাছে হেরে যাচ্ছে।

পরদিন মেসে ফিরে মালঞ্চ পার্কে যায় সন্ধ্যায়। মেসের অন্য রুমমেটরা ছুটিতে আছে। গত কয়েক দিন রাতে ঠিক মতো ঘুম হয়নি।

সকাল আট বেজে গেলে মেস মালিক সুরোজকে ডাকতে যায়। দেখে নিশ্চল হয়ে বিছানায় পরে আছে সুরোজ। বিছানায় ছড়ানো ট্যাবলেটের কতগুলি ফাঁকা মোড়ক। পাশে ডাইরির সেই পাতার নিচে লেখা - "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল..."

শামিমা

নরেশ মণ্ডল

মেইন গেটের সামনে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এখানে দাঁড়াবার বড় কারণ হলো কেউ এলে বা গেলে দেখা হবার সম্ভাবনা প্রবল। ঘড়িটা দেখে। না এখনও সময় পার হয়ে যায়নি। ঠিক দুটো দশ নাগাদ দেখতে পেল। ওড়নাটা ঠিক করতে করতে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। একটু দেরির জন্য তার কোনো ভূমিকার দরকার পড়ে না। নির্বিকারভাবে পাশটিতে এসে দাঁড়ায়। বলে –

-তুমি কখন এসেছো। নিশ্চয় অনেকক্ষণ।

-কে বলল।

-না, কেউ বলেনি। তোমার মুখ দেখে মনে হলো।

-তুমি সাইকিয়াট্রিস্ট হলে ভালো হতো।

-তুমি ঠিক বলেছো। তোমার মতো অনেকেই আমাকে এই কথা বলেছে।

-মানে ! আমার মতো অনেকে !

-হ্যাঁ, ঠিক তোমার মতো।

-তাহলে আমি...তাহলে...। আর কথা এগোয় না ওর মুখে। কে যেন মাঝপথ আটকে দিয়েছে। যেখান থেকে বেরতে পারছে না সে। মনের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করে। অব্যক্ত সে বেদনা। আশপাশের গাছের সবুজ পাতাগুলো তির তির করে কেঁপে ওঠে। ওরাও কি অনুভব করতে পারে ! আকাশে কথাগুলো বিষণ্ন মালার মতো ছড়িয়ে যায়। যে কোন মুহূর্তে তা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়বে। কারা যেন কথা বলে।

-কি হলো তোমার। কেমন যেন হয়ে গেলে।

-কই। না না, তুমি ভুল দেখছো।

-আমি ভুল দেখছি।

-ঠিক।

-ঠিক মানে। আমি চোখে ভালো দেখতে পাই না। সেটা বোঝাতে চাইলে। তাই না। নিজেকে খুব চক্ষুষ্মান মনে কর।

-আরে বাবা আমি সে কথা তোমায় কখন বললাম। তুমি না বেশ বানিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে কথার জাল বুনতে পারো। তোমার কথায় কত না জানি প্রজাপতি জড়িয়ে পড়েছে সেটা জানাটা তো খুব জরুরি দেখছি। তুমি তো দেখছি বিশ্বাসের সীমারেখা পার হয়ে যাচ্ছ। বেশ দক্ষ তো তুমি এ ব্যাপারে। আগে তো ঠিক বুঝতে পারিনি। তলে তলে কতটা জল খাচ্ছো। কী হলো এবার চুপ কেন।

-আমি তো তোমার কথার কোনো মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। আমি মাকড়শা। জাল বুনি ! তাতে

প্রজাপতি ধরি। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি ! মানেটা কি মিস্টার ? তুমিতো দেখছি বেশ দক্ষতার সঙ্গে চক্রব্যূহ রচনা করছো।

-কি আমি চক্রব্যূহ রচনা করছি। আমার নামে দোষারোপ করা। এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। আমি তাহলে...

-বা, কী সুন্দর। নিজে সাজিয়ে এখন আমার নামে বদনাম দিচ্ছো। আমি আর একমুহূর্তও এখানে থাকব না। তোমার মতো মানুষের সঙ্গে মেশাটাই আমার ভুল হয়েছে। সুস্মিতা তখন ঠিকই বলেছিল। দেখেশুনে মিশিস। যার তার সঙ্গে মিশবি না। বিপদে পড়বি। এখন তো দেখছি ও ঠিক কথাই বলেছিল। আমি ওর কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে দেখছি ভুল করেছি। সত্যি তো ! বলে একবার ওর মুখের দিকে তাকায়। দেখে মেঘলা।

-আবার চলে যাবার হুমকি দিচ্ছো। তুমি তো ভালো অভিনেত্রী।

-আমি অভিনেত্রী ! তুমি আমাকে এ কথাটা বলতে পারলে। চললাম। আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মাথা ঠাণ্ডা করো। চা খাও গিয়ে। বলে হন হন করে পা চালায়।

-অপেক্ষা করছে মানে ?

-মানে কেউ অপেক্ষা করছে। তোমার মতো। হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিয়ে যায়।

রাত বাড়ে। অমিতেশ বারান্দায় চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে। সেই যে ফিরে এসেছে তারপর আর বাড়ির বাইরে বের হয়নি। দরকার ছিল কিন্তু ওর বেরুতে ইচ্ছে করেনি। ফিরে এসে শুয়ে ছিল। বেশিক্ষণ পারেনি। উঠে পড়ে। একটা বই নিয়ে বসে। অনেকদিন পড়ে আছে পড়া হয়নি। মাঝের অসুস্থতা ওর অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে। এই বইটার একটা আলোচনা না করে দিলে নয়। বেশ তাগদা দিচ্ছে। কয়েকটা পাতা পড়ে। আর মন বসাতে পারে না। দুপুরের ঘটনাটা তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না।

-মা, মাসিকে বলতো একটু চা দিতে

-এখন চা খাবি !

-হ্যাঁ, ভালো লাগছে না।

মা বিছানা থেকে উঠে আসে। কি হয়েছেরে বাবু। বাড়ি ফেরার পর থেকে কেমন যেন গুম মেরে আছিস। মাঝে মাঝে বারান্দায় যাচ্ছিস। কতবার চা খেলি বল তো। শরীর খারাপ তো নয়। ও কি তোকে কিছু বলেছে।

-তুমি গিয়ে শুয়ে পড় মা। রাত হয়েছে। তোমার শরীর খারাপ হলে খুব সমস্যায় পড়ে যাব। এমনি আমার অসুখের জন্য অনেক দিন ছুটিতে কেটেছে। তোমার কিছু হলে বুঝতেই পারছো। যাও শুয়ে পড়।

পরিবারের রক্ষণশীলতার আগল ভেঙে গিয়েছে অমিতেশের অসুখের সময়। রাত তখন বেশ গভীর। বেডে সে ছটফট করছে যন্ত্রণায়। নার্স দেখে যাবার পর ডাক্তারবাবু এসেই ওটির ব্যবস্থা করতে বলেন। খবর যায় সিনিয়র ডাঃ বোসের কোয়ার্টারে। রক্তের প্রয়োজন হয়। বাড়িতে খবর দিতে

বারণ করেছে অমিতেশ। কাগজপত্রে আগেই সই-সাবুদ করে রেখেছে সে। যাতে রাতবিরেতে কিছু হলে মাকে যেন ব্যস্ত হতে না হয়। রক্তের ব্যবস্থা হয়ে যায়। অপারেশনও। কোনো নতুন উপসর্গ দেখা দেয়নি। রোগী ভালোই আছে।

অমিতেশের খবরটা সকালে শোনার পর উদ্বিগ্ন অমিতাদেবী ভাইপো মিহিরকে পাঠান। সব শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হন বটে। রক্ত দানের ব্যাপারটা জানার পর নিজেকে অনেক বোঝ দেবার চেষ্টা করেন। মিহিরও বোঝায়। রক্তের কোনো জাত হয় না। ধর্ম দিয়ে মানুষ বিচার করাটা ঠিক না। দিনকাল অনেক পালটে গেছে। একজনের জীবন বাঁচাতে অন্যজন এগিয়ে আসে। না হলে মানুষ বাঁচবে কি করে। একে অপরের পাশে থাকবে এটাই তো ঠিক।

বিকালবেলা খাটের উপর আধশোয়া অমিতেশ। কেমন আছেন ? ফুল হাতে শামিমা।

-ভালো। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। নামটা...

-শামিমা।

বুকের ভেতর ঢাকের বোল। চেয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। চোখ নামাতে পারে না অমিতেশ। শামিমা ! তুমি ! শামিমা। তুমি বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো। কথাটা বেরিয়ে গেছে।

-কেন কি হয়েছে। তুমি বলতে পারেন। কোনো অসুবিধে নেই।

-তোমাকে দেখব বলে দু'দিন অপেক্ষা করেছি।

-আমার জন্য ! আমি একজন সাধারণ মানুষ। অপেক্ষা করার কি আছে। কেউকেটা হলে না হয় কথা ছিল। তাই না। আপনি কি বলেন।

কথাগুলো রিনিঝিনি শব্দ করে কানের ভেতর ঢুকল। ছড়িয়ে পড়ল মনের এদিক সেদিক।

শামিমা, তুমি ডাক্তার না হয়ে উকিল হতে পারতে।

-তাই। তাহলে যে আপনি আমায় দেখতে পেতেন না। এত কথাও বলতে পারতেন না।

-না, না তুমি ডাক্তারই ভালো। অন্য কিছু হতে হবে না। ডাক্তার না হলে আমাকে দেখতো কে। তুমি এখানে বোসো। তুমি রোজ আসবে তো। আবেগ মিশ্রিত গলায় বলে অমিতেশ।

-আমি কেন রোজ রোজ আসতে যাব ! এই তো দেখে গেলাম আজ। আপনার ছুটি হবার আগে পারলে একদিন দেখে যাব। যদি সময় পাই। কিছু মনে করবেন না। অনেক রোগী তো আমাদের দেখতে হয়। তাই না অমিতেশ বাবু। সবার কাছেতো রোজ রোজ এত সময় বসে কাটানো যায় না। আপনি আজ আছেন কাল সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। ভলো থাকবেন। আপনার মতো আরও কত রোগী আসবে। চলেও যাবে। এই বাস্তবতা তো মেনে নিতেই হয়।

অমিতেশ কোনো কথা বলতে পারে না। শুধু শামিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শান্ত অথচ কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সাজগোজে নেই কোনো উগ্রতা। লাবণ্য আছে। মায়াময় চোখ।

-ঠিক কথা বলেছো তুমি। তবু যাবার আগে যদি একবার আসো।

রাত বাড়তে থাকে। চায়ের কাপটায় চুমুক দেয় অমিতেশ। মনের মধ্যে তোলপাড় করে। শামিমা কেন এমন ব্যবহার করল। ও কি অন্যায় করেছে। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কিছুই মনে করতে

পারছে না। শরীরটা কেমন করছে। জ্বর জ্বর ভাব। চা-টা শেষ করে সে টলমল পায়ে নিজের ঘরে চলে যায়। চটিটা কোনো রকমে খুলে বিছানায় গা-টা এলিয়ে দেয়।

বেলা বাড়ে। অমিতেশকে চায়ের টেবিলে না দেখে অমিতা ছেলের ঘরে আসেন। চাদর গায়ে দেখে কাছে গিয়ে ছেলেকে ডাকেন। কোনো সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দেন। জ্বর !
কপালে হাত ছোঁয়ান। গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

কপালে জল-কাপড় দিতে হবে। মাসি জল-কাপড় দিয়ে যায়। অমিতা ছেলের মাথার কাছে বসে ভেজা কাপড় বার বার পালটে দিতে থাকেন। গা-টাও মুছিয়ে দেন ভালো করে। মাথাও ধুয়ে দিয়েছেন। আর একবার জ্বরটা দেখেন। আগের থেকে কমেছে। একটু আস্বস্ত লাগে। কখন থেকে জ্বরটা হলো জানতে পারেননি। মায়ের মন। অস্থির লাগে। অমিতেশ একটু ঘাড় কাত করে। মাথা তোলার চেষ্টা করে। পারে না।

-এখন কেমন লাগছে। চা খাবি?

-দাও। অস্পষ্ট স্বরে বলে অমিতেশ।

অমিতা নিজের হাতে চা নিয়ে আসেন। সঙ্গে যে আসে তাকে দেখে অমিতেশ অবাক হয়ে যায়। তুমি ! দুকাপ চা নামিয়ে রাখেন অমিতা। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর শামিমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, বসো। থুতনিতে হাত বুলিয়ে চুমু খান। ঘর থেকে চলে যেতে যেতে বলেন, আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি।

-তুমি আমাকে দেখে খুশি হওনি তো। বিরক্ত বোধ করছো। কি, তাই তো।

-তুমি এসব কি বলছো। অস্পষ্ট স্বরে কথাগুলো বলে। শরীরটা ভালো না।

-কি হয়েছে তোমার। দেখি। এখনও তো জ্বর আছে। বেশ হয়েছে কদিন বাড়িতে থাকো বসে। বাইরে বেরুতে পারবে না। আমি ঘুরে বেরাবো। একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। কেউ আছে বাড়িতে যাকে দিয়ে আনিয়ে নিতে পারবে ! না আমি এনে দেব। না ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। বলে চা শেষ করে শামিমা বের হয়। রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বলে, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি ওষুধ আনতে।

-তুমি বসো না। সুমিতাকে পাঠাবো।

- না না বেশি সময় লাগবে না। আমি নিয়ে আসছি।

মাথার কাছে টেবিলটায় ওষুধগুলো রাখে। কোনটা কখন খেতে হবে লিখেও দেয়। মনে করে খাবে কিন্তু। কদিন বিশ্রাম নাও।
যাবার আগে অমিতেশের কপালে হাত রাখে। না, ঠিক আছে। আস্তে আস্তে কমে যাবে। এবার আমি যাই। অমিতেশ ওর হাতটা চেপে ধরে। বলে, আমার মতো কেউ অপেক্ষা করছে।

করতেই পারে, বলে শামিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পিতা-পুত্র

আখতার মাহমুদ

(১)

মনির সাহেব আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন মাত্র, এসময় তাঁর সেক্রেটারী মেয়েটা বিভ্রান্ত মুখে ভেতরে ঢুকে ডাকল- 'স্যার?'

মনির সাহেব ভীষণ বিরক্ত হলেন। সিগারেট খাওয়ার সময় অধস্তনদের সামনে এসে পড়াটা ভারি অপছন্দ তাঁর। এছাড়া অনুমতি ছাড়া তাঁর রুমে প্রবেশ করাও ভয়ানক অপছন্দ করেন তিনি। মেয়েটা এসব জানে, তবুও সে অনুমতি না নিয়েই ঢুকে পড়েছে। কড়া একটা ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। শুধু মাথা একপাশে কাত করে প্রশ্নবোধক চোখে তাকালেন। মেয়েটি বলল, 'স্যার, একজন ক্যান্ডিডেট এসেছে। এখন পাঠাব?'

এডমিন অফিসার পদে ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ-এর তারিখ তিনি নিজেই ঠিক করে দিয়েছিলেন। সকালে মেয়েটা একবার মনে করিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু মাথা থেকে ছুটে গিয়েছিল ব্যাপারটা। ঘড়ি দেখলেন তিনি। তিনটে বাজে প্রায়। ভেবেছিলেন লাঞ্চের পরে খানিক বিশ্রাম নেবেন, কিন্তু হলো না সেটা। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, 'মিনিট পনেরো পরে পাঠাও। আর কফি দিয়ে যেয়ো আমাকে। ব্ল্যাক।'

'স্যার ছেলেটা...'

মনির সাহেব আগুন চোখে তাকাতেই মেয়েটি কথা হারিয়ে ফেলে ঢোক গিলল। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। ওই দৃষ্টি সে বোঝে। এমনিতেও বুঝতে পারছে অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়ায় বস নাখোশ হয়েছেন। কিন্তু, সে যে ভয়ানক বিস্মিত হয়েছে, সেটা বসকে না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিল না। বিস্ময়ের কারণ- ক্যান্ডিডেট ছেলেটা। সে দেখতে হুবহু বসের মত। যেন বসের তরুণ বয়সের সংস্করণ। বসের পরিবার সম্পর্কে না জানা থাকলে সে ধরেই নিত ক্যান্ডিডেট বসের ছেলে। সে জানে- বসের দুই মেয়ে। কোন ছেলে নেই। যাই হোক, ছেলেটা ভেতরে ঢুকলে বস নিজের চোখেই দেখবে। বসের রুম থেকে বেরিয়ে ছেলেটিকে অপেক্ষা করতে বলে নিজের কাজে মন দিল সে। মিনিট দশেক পর মনির সাহেব ইন্টারকমে ছেলেটাকে পাঠানোর জন্যে বলতেই তাঁর সেক্রেটারী ছেলেটিকে ভেতরে পাঠিয়ে উৎসুক মনে অপেক্ষা করতে লাগল বসের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে।

ছেলেটি ভেতরে পা দিয়েই পাথরের মত জমে গেল। মনির সাহেব কিছু কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন ইন্টারভিউ নেয়ার জন্যে। ক্যান্ডিডেট ভেতরে ঢুকেছে টের পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন এবং তিনি প্রায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বুকে ধড়ফড় শুরু হল তার। তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি?' যেন আর কেউ শুনে ফেলার ভয় করছেন।

ছেলেটি বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে আমতা আমতা করে বলল, 'আ..আম...আমি জাভেদ, জাভেদ হোসাইন। ইন্টারভিউ দিতে এসেছি।'

টেবিলের ওপর রাখা বোতল থেকে ঢকঢক করে পানি খেয়ে একটু সুস্থির হলেন তিনি। ছেলেটিকে বসতে বলে নিজেও বসলেন। বুকের ভেতরটা এখনো ধড়ফড় করছে, তবে ওটা কমে আসছে মনে হল তাঁর। কাঁপা কাঁপা হাসলেন তিনি। হাসলেন বলা আসলে ঠিক হচ্ছে না, হাসার চেষ্টা করলেন।
'আমাদের চেহারায় অদ্ভুত মিল, তাই না?'
ছেলেটিও চমক সামলে মৃদু হেসে বলল, 'জ্বি স্যার।'
'পড়াশুনা কত দূর করেছো?'
'অনার্স করেছি। মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছি।'
'মাস্টার্স শেষ করার আগেই চাকুরি খুঁজছো?'
'জ্বি স্যার। গ্রামে মা-বাবা অনেক কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন।
তাদের সাপোর্ট দেয়া দরকার।'
'হুম। কোথায় তোমার গ্রাম ?'
'চরপার্বতী, বসুর হাট।'

বুকের ভেতর পাগলের মত লাফালাফি শুরু করল তাঁর হৃৎপিন্ডটা। তাঁর বিশ্বাস, পৃথিবীতে কাকতালীয় বা অতিপ্রাকৃত কোন বিষয় নেই। সব কিছুরই পেছনে কোন না কোন কারণ থাকে, ব্যাখ্যা থাকে। তবে কি ? না না সে কি করে হয়, এমনটা হতেই পারে না। অতীত এত তীব্র হয়ে কখনো ফিরতে পারে না। হঠাৎ-ই বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করলেন তিনি। টের পেলেন, দরদরিয়ে ঘাম বেরুনোর সাথে সাথে বুকের ভেতর চিনচিনে একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। মনির সাহেব অনেক কষ্টে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মায়ের নাম কি ফিরোজা ?'

ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, 'জ্বি স্যার। আপনি আমার মা-কে চেনেন ?' তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। বুক চেপে ধরে গোঁ গোঁ করতে করতে চোখ উল্টে চেয়ারসমেত কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

(২)

মনির সাহেব চোখ মেলে দেখলেন একটা ধবধবে সাদা কেবিনে শুয়ে আছেন। কেবিনে কেউ নেই। মুখে অক্সিজেনের নল লাগানো। দেখলেনই কেবল। বুকের ভেতর চাপ চাপ ব্যথা ছাড়া আর কিছু টের পেলেন না। সারা শরীর অসাড় হয়ে আছে। মাথা বাদে শরীরের আর কোনো অঙ্গ এক চুলও নাড়াতে পারলেন না। মেজর হার্ট অ্যাটাকের কবলে পড়েছেন বুঝতে পারলেন। প্রথমে আতঙ্কিত হলেন খুব। তবে হার্ট অ্যাটাকের পূর্বের ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় আতঙ্কের বদলে গ্লানি এসে ভর করলো মনে। সাথে সাথে ফিরে এল জীবনের একমাত্র পদস্খলনের স্মৃতিটি। সাতাশ-আটাশ বছর আগের সেই পদস্খলনের স্মৃতি এত তীব্র হয়ে ফিরবে কখনো ভাবেননি। ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁর জীবনে ওরকম একটা রাত এসেছিল!

ফিরোজাকেও মনে ছিল না। যদিও ফিরোজাকে সেই রাতে চিঠির ঠিকানা দিয়ে এসেছিলেন, যেন প্রয়োজন পড়লে যোগাযোগ করতে পারে। ফিরোজ কখনোই যোগাযোগ করেনি। নিজের ছোট ব্যবসা

বড় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টার ভীড়ে অন্য সব স্মৃতি ফিকে হয়ে গেছিল। ভুলে গিয়েছিলেন পদস্খলনের সেই স্মৃতি। মনেই ছিল না ফিরোজা বলে কারো সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল।

সাতাশ-আটাশ বছর আগে এক ঘনিষ্ট বন্ধুর বিয়ের দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন চরপার্বতী গ্রামে। সীমাহীন আনন্দে বন্ধুরা মিলে উপভোগ করছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠান। বন্ধুটি হিন্দু ছিল। ওদের ধর্মীয় আচার-রীতি সব সারারাত ধরেই চলছিল। সেই মধ্যরাতেই ফিরোজাকে তাঁর আবিষ্কার অসংখ্য মুখের ভীড়ে। প্রতিবেশির বিয়েতে আনন্দ করছিল। ধারাল-স্পষ্ট চোখের দৃষ্টি, সরল মুখভঙ্গী, আর গালে টোল ফেলা হাসি; মনির সাহেবকে থমকে দিয়েছিল। এরপর টুকটাক চোখাচোখি, হাসি-পাল্টা হাসি, কথা-পরিচয়। ফিরোজা সদ্য বিবাহিত জেনে প্রথমে মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবে বিয়ের উৎসবের উচ্ছাসে ভেসে গিয়েছিল ওসব মন খারাপ-টারাপ!

বিয়েতে সাতপাঁকের প্রস্তুতির ফাঁকে দুজনে কথা বলতে বলতে বিয়ে বাড়ির ভীড় ছাড়িয়ে, আলোর রোশনাই এড়িয়ে নির্জন কাছারি ঘরে কখন কিভাবে পৌঁছে গিয়েছিলেন তা এখন আর ঠিক মনে নেই তাঁর। হয়তো নিজের অজান্তেই ফিরোজা পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথবা নিয়তি। নাকি যুক্তিহীন কামনা ? মনির সাহেবের এখনো স্পষ্ট মনে আছে কাছারি ঘরের আবছা আলো আঁধারে দুজন মুখোমুখি নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘ অনেকগুলো দিশেহারা মুহূর্ত। বিয়ে বাড়ির ভেসে আসা উলুধ্বনি আর তাদের ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ ছিল না চারপাশে। একসময়, হয়ত ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, ফিরোজা নড়ে উঠতেই মনির সাহেব হাত ধরে কাছে টেনেছিলেন। ফিরোজা শিউরে উঠেছিল, তবে বাঁধা দেয়নি। কি ভেবে কে জানে, নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল অচেনা শহুরে আগন্তুকের হাতে। মনির সাহেবের মনে হয়েছিল, এ-যেন অনেকটা সব যুক্তি-বিবেক একপাশে সরিয়ে লন্ডভন্ড হওয়ার নেশায় নিজেকে প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ের মুখে ছুঁড়ে দেয়ার মত ব্যাপার।

ঝড় থেমে গেলে বিভ্রান্ত মনির জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন?'

ফিরোজা তাঁর পায়ের উপর প্রণামের ভঙ্গীতে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'আমি জানি না, কিচ্ছু জানিনা !'

এরপর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে নত মস্তকে। মনিরও ফিরেছিলেন অদ্ভুত এক বিষাদ-গ্লানি নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে। ততক্ষণে বর-কনের শুভদৃষ্টি হয়ে গেছে।

(৩)

জাভেদ, আই.সি.ইউ-তে মনির সাহেবের কেবিনে ঢুকে বিছানায় বসতেই চোখ খুলল মানুষটা। তাঁর চোখে গ্লানি আর ব্যথিত দৃষ্টি। জাভেদ কোন ভূমিকা ছাড়াই মৃদু স্বরে বলতে শুরু করল, 'আমি জানি, আপনি সব শুনছেন-দেখছেন। আপনাকে কিছু কথা বলব বলেই, অনেক কষ্টে লুকিয়ে ঢুকেছি আপনার কেবিনে। আমি মা-বাবার বড় সন্তান। আমার ছোট দুই ভাই আছে। ছোটবেলা থেকেই আমার প্রতি মায়ের আচরণ ছিল ভীষণ রূঢ়। সবসময়ই আমার মনে হয়েছে আমি মায়ের চক্ষুশূল। আমার চোখের সামনেই অন্য দুই ভাইকে পরম মমতায়

আগলে রেখেছেন, আর আমি যেন থেকেও নেই ছিলাম মায়ের কাছে। যদিও বাবা যথেষ্ট নমনীয় ছিলেন, মায়ের নিষ্ঠুর আচরণ ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন আমাকে। বড় হওয়ার সাথে সাথে আমার প্রতি মায়ের নিষ্ঠুর আচরণ বেড়ে যেতে থাকে। মা আমাকে সহ্যই করতে পারতেন না। যেন আমি তার আপন সন্তান নই। মায়ের নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বাঁচাতে বাবা আমাকে হোস্টেলে রেখে পড়াশুনা করিয়েছেন টাকা-পয়সার টানাটানি সত্ত্বেও। কোনদিন এতটুকু আদর পাইনি মায়ের। ধরেই নিয়েছিলাম, আমারই কোন ত্রুটি আছে যা মা-কে আমার প্রতি বিরূপ করে তুলেছে।'

কথাগুলোর সাথে সাথে টপটপ চোখের জল ঝরছিল তার। একটানা কথাগুলো বলে থামল সে চোখের পানি মুছে নেয়ার জন্যে। দু'হাতে চোখ-মুখ মুছে মনির সাহেবের একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আবারো বলতে শুরু করল- 'আপনাকে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম এরকম ঘটতেই পারে। বিস্ময়কর পৃথিবীর কতটাই বা জানি আমরা। কিন্তু মায়ের নাম শোনার সাথে সাথে আপনার হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা আমাকে অন্য পথে ভাবতে বাধ্য করে। আপনাকে ক্লিনিকে পৌঁছে দেয়ার পর গ্রামে গিয়ে মায়ের মুখোমুখি হই আমি। মা আমাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। আমার কাছে স্বীকার করেছেন, জীবনের একমাত্র পদস্খলনের কথা। এরপর আমার প্রতি মায়ের নিষ্ঠুর আচরণের কারণ বুঝতে কষ্ট হয়নি। আ...আমি সত্যটা জানার পর নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছি। চেষ্টা করেছি আপনাকে ক্ষমা করে দিতে। আমি পারিনি। আমাকে সারা জীবন মায়ের নিষ্ঠুরতা আর ঘৃণার মত ভয়ংকর অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয়েছে। তীব্র কষ্টে কেটেছে আমার শৈশব-কৈশোর। একটা মানুষের সবচেয়ে আনন্দ মুখর হবার কথা যে সময়, সে সময়ে আমি পেয়েছি মায়ের সীমাহীন অত্যাচার। আপনাদের নিজেদের ভুলের মাশুল আমাকে দিতে হয়েছে সমস্ত জীবন ধরে। আমি কী করে ক্ষমা করব আপনাকে বা মা-কে? মা-কে চিরজীবন কষ্টে রাখব আমি। নিজের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে মা-কে কষ্ট দেব। আর আপনাকেও কোনভাবেই ক্ষমা করতে পারিনি। অতটা মহৎ আমি নই....'

মনির সাহেবের ভীষণ ইচ্ছে করছিল জাভেদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। ছেলেটার কষ্টের গল্প তাঁর চোখেও জল এনে দিয়েছে। অশ্রুসিক্ত চোখে জাভেদ আলতো করে তাঁর মুখের ওপর থেকে অক্সিজেন মাস্ক সরিয়ে ফেলছে দেখেও ভয় এল না মনে। মনে হল, প্রাপ্য শাস্তিটাই পাচ্ছেন তিনি। তবে একটা আফসোস থেকে গেল, একটিবারও ছেলেটার মাথায় হাত রাখতে না পারায়। কয়েক মুহূর্ত পর অক্সিজেনের অভাবে খাবি খেতে শুরু করলেন মনির সাহেব। চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তাঁর মনে হল অসংখ্য সুঁচ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে হৃৎপিন্ডের ভেতর। কয়েকবার তীব্র খিঁচুনি দিয়ে উঠল তার পুরো শরীর। তাঁর দুর্বল হৃৎপিন্ড দুই মিনিটের বেশি বুঝতে পারল না। থেমে গেল ওটা। জাভেদ তখনো মনির সাহেবের স্পন্দনহীন হাতখানা ধরে রেখে কেঁদে চলেছে।

অস্ফূট আর্তি

আবু রাশেদ পলাশ

মিয়া বাড়ির মসজিদে ফজরের আযান ধ্বনিত হলে নিশিতে নিদ্রিত মানুষগুলোর নিদ্রা ভাঙে। রাতের গায়ে জোছনা শোভিত অন্ধকার তখন আরেকটি নতুন প্রভাতের ডাক শুনে দিনের আলোয় মুখ লুকায়। গৃহস্থ বাড়ির মোরগটাও নিদ্রা ভাঙার গান জুড়ে এসময়। শব্দ শুনে ঘুম কাতর শিশুগুলোকে মায়েরা ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়। আধো ঘুমে ঢলঢল শিশুগুলো বাইরে এসে ছাইয়ের গাদা থেকে পোড়া কাঠের কয়লা তুলে মাজন করতে করতে পুকুরের দিকে চলে যায়। একসময় প্রভাত কাকলির মধ্যে আগমন ঘটে দিনের সূর্যটার।

গ্রামের নাম চৌহালি। তার জন্মের ইতিহাস কালগর্ভে বিলীন। ওর বুক জুড়ে বহমান কালীনদীর স্রোতপ্রবাহ এ গ্রামকে হিন্দু-মুসলমান পাড়ায় বিভাজিত করেছে। নদী নারী পুরুষের মিলনস্থল। স্থান,কাল নির্বিশেষে একই নদীর স্রোত জলে স্নান করে শুদ্ধ হয় সবাই। এ গাঁয়ে মুসলমান পাড়ার উত্তরে মিয়াদের বাস। অপেক্ষাকৃত জনবহুল এ জায়গাটা গাঁয়ে টুগিপাড়া নামে পরিচিত। এখানে ভূমিহীন ওই মানুষগুলো বসবাস করে নিম্নবিত্তের দৃষ্টিতেও যারা গরীব। ওদের থাকার জায়গাও সামান্য। ঘরগুলো একটার সাথে আরেকটা লাগানো।

বুড়ো বাহারুদ্দিন মিয়াবাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠ। সংসারে স্ত্রী ছাড়াও একমাত্র মেয়ে আছে তার। নাম জরি। কয়েক বছর আগে উজানতলীর হাসেমের সাথে বিয়ে হয়েছিল ওর। সংসার টিকেনি সেখানে। স্বামী তালাক দিলে এখন বাপের বাড়ি এসে থাকে সে। বাহারুদ্দিনের ঘরের সাথে লাগানো ছোট ছাপরা ঘরগুলো আহালু, আরজ আর মধুর।

চৈত্রের আকালে মধু ভাঙ্গুরা বাজারে বড়কর্তার আড়তে কাজ করে। সাথে হিন্দুপাড়ার ভোদড়ও। কাজ শেষে একই পথে বাড়ী ফিরে ওরা। রাতে মধু যখন এসে পৌঁছায় মিয়া বাড়ির ঘরগুলোতে পিদিমের শেষ আলোটা নিবু নিবু করে তখন। ভেতরে ঢুকে ম্যাচের কাঠি জ্বালালে জরির রেখে যাওয়া কিছু একটা চোখে পড়ে তার। আনন্দে চোখগুলো জ্বলজ্বল করে তখন। খেতে বসলে জরির কণ্ঠ শুনা যায়।

-মধু ভাই আইলা ?

-হ, ঘুমাস নাই অহনো ?

-চইত মাসের গরমে পুইড়্যা মরি।

-হাঁচানি ? গতরে সার পাইন্যা আইজ, জার করে কেবল।

-কি কও, জরনি আহে দেহি ?

তারপর মধুর কপালে হাত দিয়ে শিউরে উঠে জরি। কখন যেন জ্বর এসেছে ওর। পরক্ষণে রসুন সমেত তেল গরম করে এনে দেয় তাকে। রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবনায় পড়ে মধু। তখন ভাবনার

জগতে সমস্ত জায়গা জুড়ে বিচরণ করে জরি। শেষরাতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে তার। সকালে বাইরে এসে জরিকে খুঁজে সে। দেখা পায়না কোথাও। আহালুর মেয়ে বুচি জানায়, ভোরে মামার বাড়ি গেছে সে, আসবে ভরসন্ধ্যায়।

মুসলমানপাড়ার খড়িমণ্ডল সচ্ছল গৃহস্থ। ঘরে জোড়া বউ তার, সন্তান নেই। এপাড়ায় সালিশ করে বেড়ায় সে। বাহারি পণ্যের ব্যবসা আছে বাজারে। একই পাড়ার শুলাই মণ্ডলের খাস লোক। মণ্ডলের ব্যবসা দেখাশুনা করে সে। বিকালে ভাঙ্গুরা বাজারে নিজের আড়তে বসলে লাভের টাকাগুলো শুলাই তুলে দেয় তার হাতে। সন্ধ্যায় ফেরার আগে এক অচেনা রমণীকে দেখলে খড়ি মণ্ডলের চোখ আটকে থাকে সেদিকে। মাঝে মাঝে ডানে বামে তাকাই মেয়েটি। সন্ধানী চক্ষুযুগল পরিচিত কাউকে খুঁজে ফিরে হয়তো। ব্যর্থ হলে আবার স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ফেরার পথে খড়ি মণ্ডল নিজের নৌকায় তুলে নেয় তাকে। মণ্ডল বলে,

-কাগো বাড়ির বেটিগো মাইয়্যা ?

-টুগি পাড়া মিয়্যা বাড়ি।

-গেছিলা কই ?

-ধানশাইল মামুগো বাড়ি।

-একলানি গেচিলা, মাইয়্যা লোকের ডর নাই ?

মণ্ডলের কথার জবাব দেয় না জরি। ও কথা না বললে মণ্ডলও চুপ হয়ে যায় একসময়। পরক্ষণে নৌকার পাটাতনের উপর একজোড়া সাদা পা দৃষ্টিগোচর হলে চক্ষু পড়ে থাকে সেদিকে। সে পা সহসা চোখের আড়াল হয় না, জরির প্রস্থানেও।

এদিকে কর্তার আড়তে কাজ না থাকলে বাড়িতে অলস সময় কাটায় মধু। ও বাড়ি থাকলে ট্রাঙ্কে রাখা আসমানি-রঙা শাড়িটা পড়ে জরি, মাথায় জবজবে তেল দেয়। তারপর ওর সামনে পায়চারী করে অনেকবার। মধু নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে হুঁকা টানে। মাঝে মাঝে আড়চোখে জরিকে দেখে সে। এরমধ্যে একদিন কালবৈশাখী ঝড় হয় গ্রামে। টুগি পাড়ায় আহালুর ঘর পড়ে যায় তাতে। সে উছিলায় একদিন মিয়া বাড়িতে আগমন ঘটে খড়ি মণ্ডলের। মণ্ডল এলে বাহারুদ্দিনের ঘরের দাওয়ায় বসতে দেওয়া হয় তাকে। মনে মনে জরিকে খোঁজে সে। দৃষ্টিগোচর হলে পুলকিত হয় মণ্ডল। যাওয়ার সময় বলে যায় -

-আহালু একবার আইয়ো আমার বাড়ি, কিছু টেহা দিমুনি। ঘরখান তুলো শিগগির।

রাতে বাড়ি ফিরে ভাবনায় পড়ে মণ্ডল। নৌকার পাটাতনে দেখা একজোড়া সাদা পা আর বাহারুদ্দিনের বাড়ির দহলিজে দেখা একটা মেয়ে মানুষের মুখশ্রী ভেতরে জ্বালা ধরায় তার। মনে মনে ঘরে তৃতীয় স্ত্রী আনার পাঁয়তারা করে সে। হ্যাঁ, আরেকটা নিকা করবে খড়ি মণ্ডল। নিকা করবে নৌকার পাটাতনে দেখা সেই সাদা পায়ের রমণীকেই।

এরপর মাঝে মাঝেই শুলাইকে মিয়াবাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। জরিকে খোঁজে সে। দৃষ্টিগোচর হলে খড়ি মণ্ডলের দেওয়া জিনিসগুলো তুলে দেয় ওর হাতে।

জরি নিতে না চাইলে শুলাই বলে -
-ডরাও ক্যান, আমিনা তোমার কাহা অই ?

বৈশাখ মাসের শেষের দিকে ব্যস্ততা বাড়ে ছেলেদেরক। ব্যস্ত হয় মেয়েরাও। সামনে আগত বর্ষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান পাড়ার ঘরে ঘরে জাল তৈরির সরঞ্জাম শোভা পায়। বড় ঘরের দাওয়ায় বসে দিনমান জাল বুননের কাজ করে সবাই। আরজের ছেলে হুলু বাজার থেকে সুতা আর বড়শি কিনে এনে মধুর জন্য অপেক্ষা করে। মধুর কাছে মাছ ধরার ছিপ বানিয়ে নিবে সে। কিন্তু সহসা সময় হয় না মধুর। এখন সে হিন্দু পাড়ায় নৌকা মেরামতের কাজে ব্যস্ত। ভোদড়কে সাথে নিয়ে আগামী বর্ষাটা বড়কর্তার নৌকায় কাটানোর ইচ্ছে তার। এর মধ্যে একদিন রাতে বাড়ি ফিরলে দেখা হয় জরির সাথে। জরি বলে-
-হারাদিন কই থাহ মধু ভাই, দেহিনা যে ?
-কর্তার নাওয়্যা কাম নিছি, বানের মসুম নাওয়্যা থাকুম।
-হলু হুতা, বশি কিনন্যা আনছে। হেরে বশি বানায় দিও একখান।

আরজের বউ জুলেখা মারা গেছে একবছর হতে চলল। মরার সময় কলেরা হয়েছিল ওর। স্ত্রী শোকে এখনো বিয়ে করেনি আরজ। মা মরা হুলু সারাদিন পোষা কুকুরের ন্যায় এ বাড়ি ও বাড়ি আনাগোনা করে। ওর দিকে দৃষ্টি গেলে ভেতরটা হাহাকার করে আরজের। মেয়ে মানুষহীন সংসার হয় না। যে ব্যাঘ্র একবার মাংসের সন্ধান পায়, পরমুহূর্তে লোভ সংবরণ করতে পারে না সে। আজকাল একাকী বিছানায় শুয়ে মেয়ে মানুষের অভাববোধ করে আরজ। নারী সত্ত্বার যে স্বাদ পেয়েছে সে, তার লোভ সামলানোর সাধ্য কোথায় ? এখন ঘরে বউ দরকার।

এরই মধ্যে একদিন শুলাইয়ের সাথে কলহ হয় মধুর। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে জরিকে হেসে কথা বলতে দেখে সে। শুধু কথা বললে হয়তো কলহ করত না মধু। শুলাইয়ের দেওয়া জিনিসগুলো যখন জরি নিল তখনই রেগে গেছিল সে। পরক্ষণে শুলাইকে একটা ঘুষি মেরেছে মধু। তারপর চিৎকার করেছে ওর সাথে -
-হারামির পুলা ইনু কি ?
-আমি আইছিনি, তোমার বইন আইতে কয় যে ? তারপর যাওয়ার সময় শাসিয়ে যায় শুলাই। “ছাড়ুমনা, মণ্ডলরে কইয়্যা শাস্তা করুম তরে”।

সেদিন জরির সাথে কথা বলেনা মধু। বড়ঘরের দাওয়ায় থ মেরে বসে থাকে অনেকক্ষণ। খড়ি মণ্ডলের কথা মনে হলে অজানা আশংকা এসে ভিড় করে নিজের মধ্যে। মুসলমানপাড়ায় এ মানুষটাকে যমের মত ভয় পায় সবাই। শুলাইকে মারার খেসারত দিতে হবে নিশ্চয়। শুলাই কি আর যে সে মানুষ ! স্বয়ং খড়িমণ্ডলের খাস লোক সে। এ পাড়ায় সবাই সমীহ করে তাকে। পরদিন দাওয়ায় বসে থাকলে এগিয়ে আসে জরি, মধুর মান ভাঙানোর চেষ্টা করে সে।
-গোস্যা অইছেনি মধু ভাই ? মধু সহসা জবাব না দিলে জরি আবার বলে- “শুলাইরে হগগল ফিরত দিমু, গোস্যা ছাড়ান দেও অহন”।

এরপর ভাঙ্গুরা বাজারে গেলে ভয়ে ভয়ে থাকে মধু। সহসা খড়ি মণ্ডলের সামনে পড়ার সাহস করেনা সে। তবুও একদিন আচমকা ডাক পড়ে ওর। পরক্ষণে খড়িমণ্ডলের আড়তে গিয়ে বসতে হয় তাকে। মণ্ডল বলে-

-মধু মিয়ানি, ভালা আছ মুনে কয় ?

-হ, ভালাই। জলদি কইয়্যা ছাড়ান দেন কাম আছে মেলা।

-বহ মিয়া তাড়া কিয়ের ? মনা একখান বিড়ি দে মধুরে। শুলাইরে মারছ হুনলাম, বিবাদ ছাড়ান দেও। হেতো তোমার কাহা অয়।

-কাহানি ? আরেকদিন আইল্যা ঠ্যাংখান ভাঙুম কই।

তারপর আর কথা বাড়ায়না মধু। সোজা গাঁয়ের পথ ধরে সে। আড়তে বসে রাগে ফোঁপায় শুলাই। খড়ি মণ্ডল ধমক দেয় -

-চেতস ক্যান হারামির পুলা, গোস্যানি তর একলা অয় ? ছাড়ুমনা নিয্যস।

বর্ষা মওসুমে হিন্দু-মুসলমান পাড়ার ছেলেরা কাজে ব্যস্ত হয়। কালীনদীর উত্তাল ঢেউয়ের সাথে তখন সম্পর্ক গড়ে ওরা। মধুকে মালবোঝাই নৌকা নিয়ে যেতে হয় ইছামতী। বর্ডারে পণ্য চোরাচালানের ব্যবসা করে বড়কর্তা। এদিকে চৌহালি কাজ না পেলে বিপাকে পড়ে আরজ। নৌকা, জাল কোনকিছুই নেই তার। হিন্দুপাড়ার যোগেশ ওর নৌকায় কাজ দিতে চেয়েছিল তাকে, গতকাল এসে না করে গেছে সে। অবশেষে উপায় না দেখে গণেশের নৌকায় দিনমজুরির কাজ নেয় আরজ আলী একদিন সন্ধ্যায় সওদা করে ফেরার পথে খড়ি মণ্ডলের সাথে দেখা হয় তার। মণ্ডল বলে -

-কার নাওয়ে কাম নিছ আরজ, ভালানি ?

-হিন্দু পাড়ার গনশা দিনমজুরি জুত নাইগো।

-তাইলে আমার নায়্যা আহ মিয়া, ভালা মজুরি দিমু নিয্যস।

হিন্দু-মুসলমান পাড়ার দরিদ্র জেলে সম্প্রদায় বর্ষার এ সময়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের স্বপ্ন দেখে। চৈত্র মাসের দারুণ অভাবে জমানো অর্থ খরচ করতে হয় তাদের। আজকের এই দুঃসময়ে খড়ি মণ্ডলের প্রস্তাবটা মনে মনে পুলকিত করে আরজকে। অবশেষে মণ্ডলের নৌকায় কাজ নেয় সে। বর্ষার মওসুম শেষ হলে অলস সময় কাটাতে হয় সবাইকে। আশ্বিন মাসে কর্তার আড়তে কাজ পাবে মধু। কালীনদীর পশ্চিমে দ্বীপসদৃশ খানিকটা জায়গা। বহুকাল ধরে চর জাগার পাঁয়তারা চলে সেখানে। নদীতে যখন থৈ থৈ পানি তখনো ওটা স্বগর্বে দাঁড়িয়ে থাকে স্বস্থানে। লোকে বলে ভাসান চর। অবসরে মধু জরিকে নিয়ে ভাসান চরে সময় কাটায়। অস্ফুট আর্তিগুলো দিনমান প্রকাশ করে না কেউ, মনে মনে নিজেদের

সহচর ভাবে ওরা। তারপর এক এক করে দিন যায়। না বলা পিছুটান গভীর থেকে গভীরতর হয়।

টুগি পাড়ার আরজ আলী বর্ষা মওসুমে বড়কর্তার নৌকায় কাজ করে মোটা টাকার মালিক হয়। বাড়িতে টিনের দুচালা ঘর উঠে তার। এ পাড়ার সবাই এখন সমীহ করে তাকে। পলিসটার কাপড়ের

একটা শার্ট আর সাদা লুঙ্গিটা পড়ে বাইরে বের হলে সালাম দেয় কেউ কেউ। এগুলো ভাল লাগে আরজের। পাড়ায় নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ভাবে সে। ভাববেই তো খড়ি মণ্ডলের খাস লোক যে। এ সম্মান টুগিপাড়ায় একমাত্র তারই। এরপর বর্ষা মওসুম শেষ হলে খড়ি মণ্ডলের আড়তে আবার কাজ পায় আরজ। বিকেলে মণ্ডল এলে খোশ গল্প করে দুজন। মণ্ডল বলে -

-এবার একখান নিকা কর আরজ, একলানি থাহুন যায় ?

খড়িমণ্ডলের কথা শুনে ইতস্তত করে আরজ আলী। কথার জবাব দেয়না সহসা। পরক্ষণে বলে-

-নিকানি ? মাইয়্যা দেহেন তাইল্যা মিয়া ভাই।

-মাইয়্যা একখান দেহা আছে, মত দেও মিয়া।

-কেডা, খুল্যা কন হুনি ?

-বাহারুদ্দির বেটি জরি। সুরতখান দলা দেহি ?

-হাঁচা। তই কাহা মত দিবনি ?

- নিয্যস মালুম অয়। চাইলে কতা কই।

খড়ি মণ্ডলের কথায় সম্মতি দেয় আরজ। জরি মেয়ে ভাল, দেখতেও বেশ। মেয়ে মানুষহীন সংসারে আরজের স্ত্রীর পাশাপাশি হুলুর জন্য একজন মা দরকার। অপরিচিত মেয়ে মানুষের মা হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু ? জরি থাকলে সে সংশয় নেই। এরপর হঠাৎই নিজের মধ্যে কেমন কামনা তৈরি হয় আরজের। বাড়ি ফিরে জরিকে নিয়ে ভাবে সে। অথচ জরির প্রতি এ ভাললাগা কয়েকদিন আগেও ছিল না তার। খড়ি মণ্ডলের বলা আচমকা কথাটা যেন প্রেমিক বানিয়ে দেয় তাকে। চোখের সামনে আনাগোনা করলে আড়চোখে জরিকে দেখে সে। বাড়ন্ত শরীরের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে উত্তাল যৌবন খেলা করে ওর। দেখলে জ্বালা করে চোখে।

অবশেষে একদিন খড়ি মণ্ডল স্বয়ং নিকার প্রস্তাব নিয়ে যায় বাহারুদ্দিনের কাছে। বাহারুদ্দিন আপত্তি করে না তাতে। অভাবের সংসারে যেখানে দুমুঠো ভাত জোগাড় করার সামর্থ্য নেই তার, সেখানে আরজ সচ্ছল গেরস্ত । প্রস্তাব মন্দ নয়। সুখী হবে জরি। বিয়ে আগামী মাঘ মাসে হোক তাহলে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে বুচির মুখে সব শুনে মধু। জরিকে দেখা যায় না কোথাও। পরদিন ধলপ্রহরে আচমকা মধুর ঘরে এসে হাজির হয় সে। জরি বলে-

-হুনছনি হগল ? তাৎক্ষণিক জবাব দেয় না মধু। ও জবাব না দিলে রেগে যায় জরি। তারপর আবার বলে- "চুপ মাইরে আছ যে, বোবা অইছ মুনে কয়"।

মধুর মধ্যে অস্ফুট আর্তনাদ তৈরি হয় তখন। মনে মনে জরির জন্য উতলা হয় সে, কিন্তু সত্যি বলার সাহস পায়না সহসা। সত্যি বলে লাভ কি, যন্ত্রণা ছাড়া ? মধু খুব ভাল করে জানে যেখানে খড়ি মণ্ডল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, সেখানে ওর কথা শুনবে না বাহারুদ্দিন। বিয়ে জরির ঠিকই হবে। বিয়ে হবে আরজের সাথেই। পরক্ষণে মধু বলে দেয়-

-আমার কিছু কওনের নাই, হুলুর মা অ তুই।

মধুর কথা মনে ধরে না জরির। কাল চোখে দুঃখের ফোয়ারা বয় তার। সেও বলে দেয়–

-দিলে ঘা দিলা মধু ভাই। ভুলুম না তোমারে নিয্যস।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কালীনদীর পানি শুকায়। স্রোতস্বিনী নদী তখন কৃপণ হয়। ঢেউ থাকে না কোথাও, দু একটা মাছ ধরার ডিঙ্গি নৌকা চোখে পড়ে শুধু। সওদাগরের নাও ভাসে না আর। নদীর উপর জেগে থাকা ভাসানচর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় দিনে দিনে । চর দখলকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষ বিভক্ত হয়। লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে বড়কর্তা আর খড়ি মণ্ডল দুজনেই। লাঠি চালনায় বিশেষ দক্ষতা থাকায় হিন্দুপাড়ার দায়িত্ব নিতে হয় মধুকে। এ নিয়ে একদিন আরজের সাথে বেশ কলহ হয় তার। আরজ বলে -

-লাঠি চালন ছাড়ান দে মধু। চরের দহল মণ্ডলরে দিমু।

আরজের কথায় রাজি হয় না মধু। সেও বলে দেয় -

-জান দিমু, চর দিমুনা মণ্ডলরে।

এরপর একদিন টুগিপাড়ায় শোকের মাতম উঠে ঘরে ঘরে। মাতম উঠে মিয়া বাড়িতেও। বুড়ি হবিরন বিবি অভিসম্পাত করে মধুকে – দিলে সবুর নাই হারামির, ভাইডারেই খাইল আইজ।

চরদখলকে কেন্দ্র করে কর্তাবাহিনী আর মণ্ডলবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয় চৌহালিতে। ক্ষুদ্র ভাসানচর রঞ্জিত হয় মানুষের রক্তে। আরজ আলী চর দখলে বাঁধা দিলে মধুর সাথে কলহ হয় তার। ক্ষুব্ধ মধু নিজের কাছে থাকা ক্ষুরধার কোঁচটা ছুড়ে দিলে ওটা গিয়ে পীঠে বিঁধে ওর। পরক্ষণে খুন খুন রব উঠে উপস্থিত সবার মুখে মুখে। মধু মিয়া খুন করেছে ওর ভাইকে। তারপর জেলে পড়ার ভয়ে গ্রামটা পুরুষশূন্য হয়ে যায় চোখের পলকে। হিন্দুপাড়ার ভোদড় পালানোর সময় মধুকে সাথে নিতে চাই তার। সে বলে-

-মধু বইনের বাড়ি পলামু, ল যাই।

সহসা কথা বলে না মধু স্বস্থানে থ মেরে বসে থাকে সে। তারপর বলে দেয়-

-যামুনা, ছাড়ান দে আইজ।

ভাসানচর সংঘর্ষ মামলায় জেল হয় মধুর। খড়ি মণ্ডল ভূমি অফিসের লোকদের হাত করে চরের অধিকার নেয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার সবাই ফিরে আসে চৌহালি। ভাসানচরে
নতুন প্রাণের উচ্ছ্বাস শুনা যায়। ওরা মধুর কথা জানে না। মধু এ পাড়ায় অতীত এখন। গ্রামে ফিরে ভোদড় দু একবার মধুর খোঁজ নিয়েছিল। তারপর আর খোঁজ রাখা হয়নি ওর।

এরপর হঠাৎ একদিন খড়ি মণ্ডলের ঘরে নবজাতকের ক্রন্দন শুনা যায়। খুশিতে জোড়া বলদ জবাই করে চৌহালি ভোগ দেয় সে। টুগিপাড়ার মেয়েরা বলাবলি করে-

-হুনছনি, মণ্ডলের ঘরে পুলা আইছে। পুলার দেহি চাঁদরূপ।

-কার কুলে অইলোগো বুচির মা ?

-আমাগো জরির।

জরি এখন সংসার করছে খড়ি মণ্ডলের ঘরে। মধুর খোঁজ আর সবার মত তারও অজানা।

আশ্রয়

দেবকুমার

১

শুভ ! নয় দশ বছরের এক সুন্দর, ছটফটে, প্রাণচঞ্চল ও সদাহাস্যমান ছেলে। একে পাশের বাড়ি, তার ওপর আবার মেয়ে খুশির সঙ্গে একই স্কুলের একই ক্লাসে পড়ে। বাবা ব্যবসার কাজে সারাদিন – মাঝে মাঝে রাতেও বাইরে থাকেন আর মা একটি বেসরকারি অফিসে রিসেপশনে আছেন। ঘরে সর্বক্ষণে আয়া কাম রাঁধুনি কাম কাজের মাসি শুভকে দেখাশোনা করেন। শুভ যেখানে থাকে সেখানে দৌরাত্ম্যের শেষ করে, তোলপাড় করে ঝড় উঠিয়ে দেয়।

এহেন শুভ ক-দিন কেমন মনমনা হয়ে গেল। সবসময় চুপচাপ, সেই প্রাণখোলা হাসি যেন আর নেই! আমরা অবাক হয়ে গেলাম। একদিন স্ত্রী ছন্দাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম– 'শুভর কী হয়েছে বলতো? কেমন যেন গুম মেরে আছে?' ছন্দা উত্তর দিল- আমরাও লক্ষ্য করেছি, খুশি বলেছিল স্কুলেও নাকি একইরকম থাকে, ইদানীং পড়াশোনাও সেভাবে করে না। ওদের কাজের মাসি অলকাদি বলছিল, ওর মা-বাবার মধ্যে আজকাল প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়।'

২

সেদিনটা ছিল রবিবার। সকালে হাট করে এসে দেখি বসার ঘরে খুশি আর শুভ বসে। খুশি আঁকছে আর শুভ উদাস চোখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি খুশিকে কাগজ আর পেন্সিল দিতে বললাম যাতে শুভও আঁকতে পারে। প্রথমে না না করলেও শেষ পর্যন্ত আঁকতে লাগলো। খুশি একটা পাতি সিনারী আঁকলো আর শুভ, আমাকে অবাক করে দিল ও! এমন পরিণত থিম- যদিও কাঁচা হাতের কাজ, তবুও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ও একটা সংসার ভেঙে যাওয়ার চিত্র ফোটাতে চেয়েছে যেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম- 'শুভ এটা কী এঁকেছো? এর মানে?'

ও কোনো রকমে আমাদের দিকে একবার তাকালো, তারপর মাথা হেঁট করে নিলো। চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। অজান্তেই আমার ডান হাতটা ওর মাথায় চলে গেল। আমাদের সামনে এ কোন ভবিষ্যৎ? খুশি আর ছন্দাও কখন আমার পাশে এসে পড়েছে। ও ফুঁপিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো...

ভ্রমণ কাহিনী

ইজিপ্ট

শ্রাবণী ব্যানার্জী

পৃথিবীতে এমন কিছু জায়গা থাকে যাদের স্মৃতি বহু বছরেও এতটুকু ম্লান হয় না আর সেই রকম একটি দেশ হল ইজিপ্ট। ছোটবেলায় 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে' গানটা গাইতে গাইতে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "মা মমি কি? সেই দেশটা কোথায়?" মা অত্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিশরের ভৌগোলিক লোকেশন ও মমি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিয়ে তার কাজ সেরেছিলেন। হায়! পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস কি পাঁচ মিনিটে বলা যায়? তাই বড় হয়ে একবার গ্রীসের এথেন্স শহর থেকে সেই 'সাহারা মরু পারে' মমির দেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

মিশরকে যে কেন নীল নদের দান বলে সেটা প্লেন থেকেই নীচের দিকে তাকিয়ে টের পেয়েছিলাম। নীল নদের দুধারে কেউ যেন দুটো চওড়া সবুজ ফিতে মাটির ওপরে পেতে রেখেছে আর তারপরেই শুধু বালি আর বালি। তাই এ নদটি না থাকলে কোনও রকম চাষ আবাদ বা সভ্যতা এদেশে গড়ে উঠত না সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। কায়রোতে হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল। কিন্তু ঢোকার মুখেই একটি ছেলে জানিয়ে দিল ওরা ওভারবুক করে ফেলেছে তাই এই হোটেলে কোনও জায়গা নেই। তবে কাছেই আর একটি হোটেলে ওরা থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আমরা তো শুনেই হাঁ। ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারের ওপর চোটপাট করতে সে বলল আমাদের

ঘর ঠিকই রাখা আছে আর বাইরের ছেলেটা অত্যন্ত পাজি তাই নিজের হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য এটাকে ফুল বলেছিল। এসব ঘটনা নাকি কায়রোতে হামেসাই হয়।
সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই সোজা ছুটলাম গিজার পিরামিড দেখতে। খচ্চরের পিঠে চেপে পিরামডের খুব কাছেই চলে যাওয়া যায়। তিনটে পিরামিডের মধ্যে সব থেকে বড় হল 'খুফু' বা 'চিয়পস্-এর পিরামিড। প্রাচীন যুগের সপ্তম আশ্চর্য্যের মধ্যে এটাই একমাত্র সাড়ে চার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় তেইশ লক্ষ বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি, যাদের মধ্যে আবার অনেকেরই ওজন প্রায় ষোলো টন। কিভাবে পাহাড় থেকে কেটে নীল নদে ভাসিয়ে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল সেটা ভাবতে গেলে এ যুগের চোখ প্রায় কপালে উঠে যায়। যখন চিন্তা করি পুলি, চাকা বা লোহার যন্ত্রপাতি সাহায্য ছাড়াই এই প্রায় পঞ্চাশতলা উঁচু সৌধটি তৈরী হয়েছিল সেটা ভাবতে গেলে সত্যিই মাথার ঠিক থাকে না।

পিরামিডের ভেতরে ঢোকাটা যে এতটা কষ্টকর হবে বাইরে থেকে দেখে খুব একটা বুঝতে পারিনি। একটিই মাত্র সরু যাতায়াতের রাস্তা সেখানে প্রায় সেমি হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। প্রায় দমবন্ধ হওয়া অবস্থাতে বেশ কিছুটা যাবার পর সেই বিশাল চেম্বারে ঢোকার সৌভাগ্য হল। রাজারানীর সমাধিস্থল ও একটি একশো তেতাল্লিশ ফিট কাঠের নৌকা ছাড়া আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। কারণ ভেতরে ধনসম্পত্তি বা সোনাদানা যা ছিল চোরেরা বহুদিন আগেই সব লুটেপুটে নিয়ে চলে গেছে। পিরামিডের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে মনে হল যেন ধড়ে প্রাণ এল। নতুন অবস্থাতে এই তিনটে পিরামিডই সাদা চুনাপাথরে মোড়া ছিল এবং সেটাকে পালিশ করে মার্বেলের মতো ঝকঝকে করে রাখা হত। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় পিরামিডকে মোড়ানো সাদা ঝকঝকে পাথরটি দূর থেকে আয়নার মতনই দেখতে লাগত। আর তাতে সূর্যের আলো পড়ে মনে হত যেন একটি প্রকান্ড তারা স্বর্গ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে। এখন মাথার চূড়াটুকু ছাড়া আর কোনওভাবেই সেটা বোঝার উপায় নেই। দুঃখের বিষয় কালের কবলে নয় মাত্র ছ'শো বছর আগে আরবরা এগুলিকে ভেঙে নিয়ে কায়রোর বহু মস্ক তৈরী করে। পিরামিডের সামনে সিংহের শরীর ও মানুষের মুখ নিয়ে গম্ভীরভাবে স্পিংস বসে আছে যার আকার আয়তন দেখলে বেশ শ্রদ্ধা জাগে। একটি পাথর কেটে করা চুয়াত্তর মিটার লম্বা ও কুড়ি মিটার চওড়া স্পিংস্ যেন সব শত্রুর হাত থেকে পিরামিডদের রক্ষা করবে বলে সামনে থাবা গেড়ে বসে আছে। স্পিংস্-এর নাকটা দেখলাম অনেকটাই ভাঙা আর দাড়িরও বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। কারণ, শোনা যায় নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সৈন্যরা স্পিংস্-এর নাকে টার্গেট প্রাকটিস্ করে বন্দুকের গুলিতে তার নাক ও দাড়ির অনেকটাই উড়িয়ে দেয়। রাতে লাইট অ্যাণ্ড সাইন্ড দেখে মনে হচ্ছিল আমরাও যেন মনে মনে হাজার হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। বার বার ভাবছিলাম আহা স্পিংস্ যদি একটু কথা বলতে পারতো তাহলে ওর থাবার কাছেই হয়তো আমি সারাদিন বসে থাকতাম।

ইজিপ্টের দ্বিতীয় দিনে আমরা কায়রো মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এখানে ইজিপ্টের ও গ্রীসের বহু সংগ্রহের সাথে সাথে বিখ্যাত ফ্যারাদের মমিও রাখা আছে। তবে সব থেকে চোখ

কাড়ে তুতেন খামেনের সংগ্রহশালা। এই বালক ফ্যারোর সমাধিস্থলই একমাত্র চোরেদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ১৯২২ সালে বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার ইজিপ্টের 'ভ্যালি অফ দ্যা কিং' থেকে এটিকে আবিষ্কার করে সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেন। সবাই সেদিন সাড়ে তিন হাজার বছর আগের সেই আঠারো বছরের কিশোর ফ্যারার কথা জানতে পারে। অনেক সোনার জিনিস পাওয়া গেলেও সব থেকে চোখে পড়ে এগারো কেজি খাঁটি সোনার একটি মুখোস। নীল রং ও সোনা দিয়ে তৈরী এই মুখোসটি বালক ফ্যারোর মুখের আদলে করা হয়েছিল। এই মিউজিয়ামে মানুষের সাথে জন্তু-জানোয়ারদের মমি দেখতে পেলাম।

ফেরার পথে একটি অল্প বয়সী ছেলে আমাকে সিস্টার বলে ডেকে এগিয়ে এলো। সে নাকি কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তাই আমাদের সাথে একটু ইংরেজি প্র্যাকটিস করতে চায়। পাশ থেকে আমার স্বামীর সাবধান বাণী শুনলাম "আমাদের গায়ের রঙের লোকেদের সাথে কোন দুঃখে ইংরেজি প্র্যাকটিস্ করতে আসবে নিশ্চয়ই টকানোর তালে আছে।" সদ্য দিদির পোস্ট পেয়ে সেকথা অগ্রাহ্য করে আমি গাসিলের সাথে গল্পে মেতে উঠলাম এবং তাকে সঙ্গে করে 'ফলাফল' রেষ্টুরেন্টে খেতে গেলাম। কথায় কথায় গাসিল জানালো জগৎ বিখ্যাত বক্সার মহম্মদ আলী তার বাবার দোকান থেকে আতর কেনে। তাই আমরাও একবার দোকানে গেলে সে অত্যন্ত খুশি হবে। দোকানে গিয়ে মহম্মদ আলীর সাথে ওর বাবার ছবি দেখে মোহিত হয়ে আমিও ঝটপট কয়েকটি আতর কিনে ফেললাম এবং পরক্ষণেই দেখতে পেলাম একটি বুড়ো মত লোক আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমার স্বামী বললেন ওই বয়স্ক লোকটাই নাকি গাসিলের সত্যিকারের বাবা অর্থাৎ মহম্মদ আলীর পাশে তোলা ছবিটা নাকি ওর বাবাই নয়। মানুষকে সন্দেহ করা মহাপাপ সেই সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আমি আতরগুলি নিয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম। বলাবাহুল্য পরের দিনই আমার ভাই গাসিল ও তার আতরের গন্ধ দুটোই আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ কর্পূরের মত উবে গেল।

কায়রোর তৃতীয় দিনে আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল 'মহম্মদ আলী মস্ক'। বিশাল অ্যালাবাস্টারের মস্কটা অনেক উঁচুতে তৈরী করায় কায়রো শহরে যেখানেই লোক থাকুক না কেন এটা চোখে পড়বেই। আমাদের হোটেলটি এর খুব কাছে হওয়ায় ভোরবেলা মিষ্টি আজানের সুরে আমাদের ঘুম ভাঙ্গত। তবে মস্কটিকে কাছ থেকে দেখে বুঝলাম এরমধ্যে টার্কিশ প্রভাব প্রচন্ড। ইস্তামুলের 'হায়া সেফিয়া' মস্কের সাথে এর মিল চোখে পড়ার মত। সন্ধ্যেবেলা ঠিক করলাম কায়রোর বিখ্যাত বাজার 'খানেনখলিলি' দেখতে যাবো। এই আটশো বছরের পুরনো বাজারটিও পুরোপুরি টার্কিশ ধাঁচে তৈরী যেখানে কাবার কফি থেকে আরম্ভ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সব জিনিসই পাওয়া যায়। পরের দিন খুব ভোরবেলা 'লাক্সার' যাবার প্লেন ধরতে হবে বলে তাই তাড়াতাড়ি কিছু কোপ্তা, ঘন দুধ ও বাদাম দেওয়া গরম ইজিপসিয়ান পুডিং 'ওম আলী' খেয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম।

প্লেন মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের কায়রো থেকে লাক্সারে পৌঁছে দিল। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে একটি টাঙ্গা নিয়ে 'লাক্সার' ও 'কর্ণাক' টেম্পিলের দিকে রওনা হলাম। 'লাক্সার' টেম্পিলে ঢোকার মুখে থেকেই দেখলাম দুধারে সার দিয়ে বিরাট বড় বড় ভেড়ার মাথাওয়ালা স্পিংস্‌রা বসে আছে যেন এদের কাজই লোকজনকে মন্দিরে ঢোকার আগে অভ্যর্থনা জানানো। ঢোকার মুখেই

বিরাট পাথরের গেট আর তার পাশে একটি উঁচু স্মারক স্তম্ভ। গেট পেরিয়ে যতটা কর্ণাক টেম্পিলের দিকে এগোতে লাগলাম ততই তার আয়তন ও স্তম্ভের উচ্চতা দেখে বিস্ময়ে মুখ এতটাই হাঁ হয়ে গেল যে ঘোর কাটতেই আমার বহুক্ষণ সময় লেগেছিল। সারি সারি স্তম্ভগুলোর নীচে মানুষদের যেন পিঁপড়ের মত দেখতে লাগছিল। মাঝখানে 'আমুন' দেবতার মন্দির এবং তাকে ঘিরে অজস্র স্তম্ভ আর তাদের গায়ে বহু কিছু হাইরোগ্লিফিকে লেখা যা পড়ার ক্ষমতা অবশ্যই আমাদের ছিল না। এই মন্দিরের সাইজ যা তাতে নিউ ইয়র্কের হাফ ম্যানহ্যাটন কভার হয়ে যায় পঞ্চাশ হাজার স্কোয়ার ফিটের এই মন্দিরে একশো চৌত্রিশটা স্তম্ভ ষোলোটা সারি দিয়ে দাঁড় করানো যাদের অনেকেরই উচ্চতা বাইশ মিটার অর্থাৎ সত্তর ফিটের ওপর। শুধু তাই নয় এদের মাথা আবার বড় বড় বিম দিয়ে ঢাকা। এসব পেরিয়ে দেখলাম আবার বিরাট মন্দির এবং সেই মন্দিরের পাশে একটি জলাধার। এই যুগেও এই মন্দিরের বিশালতা ও স্ট্যাচুর সাইজ দেখে মাথা ঘুরে যায় আর প্রায় চার হাজার বছর আগে ক্রেনের সাহায্য ছাড়া এটি কিভাবে তৈরী করেছিল সেটা চিন্তা করলে বিস্ময়ের ক্ষমতাটাও যেন ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। সেদিন রাতে চার হাজার বছরের কর্ণাক টেম্পিলে লাইট অ্যান্ড সাইন্ড দেখে মনের মধ্যে যে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল যার স্মৃতি আজও এতটুকু নষ্ট হয়নি।

কায়রো, মহম্মদ আলী মসজিদ কর্ণাক টেম্পিল

পরের দিন সকালে আসোয়ান যাবো বলে ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলাম। লোকজন বলল যদিও ট্রেন সকাল আটটায় কিন্তু এদেশে দু-তিন ঘন্টা লেট্‌কে লোকে লেট্ বলে গন্য করে না। তাই আটটার বদলে দশটায় ট্রেন ছাড়তেই আমরা বেশ খুশি হলাম। এই তিন ঘন্টা ট্রেন জার্নিতে একটিই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল- এক স্যুইস ভদ্রলোকের সাথে আলাপ, যিনি নাকি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি

দেশেই ঘুরেছেন। উনি ভারতবর্ষ থেকে মোটর সাইকেল চেপে পাকিস্তান ইরান ইরাক ঘুরে স্যুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত গেছেন। শুনে মনে হল তখনি একটু পায়ের ধুলো নিই। এই যুগেও যে হিউয়েন সাংরা পৃথিবীতে বিচরণ করে কে জানতো! স্যুজারল্যাণ্ডের সবুজ পাহাড়ে ঘেরা শান্ত নিরুপদ্রব জীবন থেকে গিয়ে ভারতবর্ষের জনসমুদ্র দেখে উনি নাকি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন। আমাদের বললেন কাশীর ফ্যাসিনেটিংগলি থেকে আরম্ভ করে থর মরুভূমিতে উটের পীঠে চাপার মধ্যে এমন একটা উন্মাদনা আছে যা পৃথিবীর কোথাও উনি খুঁজে পাননি। ওনার সাথে বিভিন্ন দেশ নিয়ে গল্প করতে করতে একসময়ে আমরা আসোয়ানে পৌঁছে গেলাম।

নীলনদের ধারেই আমরা যে হোটেলটি বুক্ করেছিলাম সেখানে জানলা খুললেই চোখের সামনে নদটা যেন ঝলমল করে উঠতো। আসোয়ানের রাস্তাতেই দেখলাম দুধারে জিনিস বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু হকারের ঠেলায় হাঁটে কার সাধ্যি। হিন্দি সিনেমার দৌলতে আমাদের স্ট্যাটাস্ দেখলাম সাহেব সুবোদের থেকে ঢের বেশী। অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা থেকে মিঠুন চক্রবর্তীর 'ডিস্কো ড্যান্সার' সবই মনে হল খুব জনপ্রিয়। সবাই বলল আমরা অমিতাভ বচ্চনের দেশের লোক তাই সস্তাতেই জিনিস ছেড়ে দেবে। সুতারাং একবার দেখতে ক্ষতি কি? একটা বিরাট দোকানে দেখলাম প্যাপিরাস বানানো দেখাচ্ছে। কারণ কাগজ আবিষ্কারের বহু আগেই মিশরীয়রা তাদের অনেক কাহিনী এই প্যাপিরাসে লিখে রাখতো। প্যাপিরাসের গাছের ছাল ফালি ফালি করে কেটে জলে পচিয়ে উদ্বৃত্ত জলটিকে বার করে পেষ্ট করা হতো। অনেকটা আমাদের দেশের চাটাই-এর মতো দেখতে লাগল। আসল প্যাপিরাসের দাম খুব বেশী। তাই অনেকেই নাকি কলার খোসা ভেজাল দেয়, যদিও সাবধান করে দিচ্ছে তাদের দোকান থেকে না কিনে অন্য কোথাও গেলে কপালে কলার খোসা ছাড়া নাকি আর কিছুই জুটবে না। সেদিন বিকেলে যখন নীল নদেতে একটা মিনি ক্রুজ নিলাম তখন আনন্দে হকারদের অত্যাচারের কথা কিছুক্ষণের জন্য পুরোপুরিই ভুলে গিয়েছিলাম। বোট থেকে যখন ডাঙায় নামছি তখন আলতো করে হাতটা ধরেই বলল বক্‌শিশ।

ইজিপ্টের বক্‌শিশ সম্বন্ধে একটা কথা জানিয়ে রাখি, এরা প্রতিটি বাক্যে একবার করে বক্‌শিশ শব্দটা উচ্চারণ করে। আপনি বক্‌শিশ সমেত দরদাম করে টাঙ্গায় উঠলেন নেমে শুনলেন টাঙ্গাওয়ালা তার আদরের ঘোড়ার জন্য বক্‌শিশ চাইছে অর্থাৎ নিজেরটা তো হয়েই গেছে তাহলে তার ঘোড়াই বা বঞ্চিত হয় কেন? ট্যাক্সি যেখানেই থামছে কিছু বাচ্ছা ট্যাক্সির দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে দিয়ে বলছে বক্‌শিশ। কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে ঘুরছেন একটা বাচ্চা আপনার ভার লাঘব করার জন্য কাঁধ থেকে প্রায় ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে বলল বক্‌শিশ।

পরেরদিন ভোর চারটেতে ভ্যানে চেপে আমরা আবুসিম্বলের দিকে রওনা হলাম। ভ্যানের যাত্রী সবশুদ্ধ সাতজন তার মধ্যে তিনজন আবার ইটালিয়ান। যেতে আমাদের সময় লেগেছিল সাড়ে চার ঘন্টা আর সেদিনই মরুভূমি কাকে বলে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি আর তার মধ্যে দিয়ে একটিই রাস্তা যেটা নাকি বালির ঝড়ে অনেক জায়গাতেই ঢাকা। যতই আমরা নুবিয়ান মরুভূমির মধ্যে ঢুকতে লাগলাম ততই আশেপাশের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠল।

বালির ওপর বেশ কয়েকটা উটের কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখলাম। কিছুদূর আবার যাবার পর আপাদ-মস্তক সাদাকাপড়ে ঢাকা একটি লোককে উটের পিঠে যেতে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম, মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা লাইন 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'। কবিতাতে যতই গ্ল্যামারাস লাগুক না কেন দেখলাম ওই কাঠ ফাটা গরম ধূ ধূ মরুভূমিতে বাস্তবে বেদুইন হওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়, মনে আছে ফেরার পথে হঠাৎ দূরে সুন্দর নীল জল দেখে বেশ লাফিয়ে উঠেছিলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভার আমার ভুল সংশোধন করে বলেছিল ওটা জল নয় মরীচিকা।

মমি আবুসিম্বল

'আবুসিম্বলে' যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সকাল নটা। একটা পাহাড় কেটে 'র‍্যামসি দ্য গ্রেট' প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এটিকে তৈরী করেন। মন্দিরটি আমুনের নামে উৎসর্গ করা হলেও দেখে মনে হল র‍্যামসি নিজেকে ভগবান বানিয়ে নিজের ঢাক পিটিয়ে গ্যাছেন। ইজিপ্টের লোকের আয়ু যখন গড়ে চল্লিশ বছরের বেশী ছিল না তখন র‍্যামসির মৃত্যু হয় তিরানব্বই বছর বয়সে। ওনার মত শক্তিশালী ফ্যারো ইজিপ্টের ইতিহাসে বোধহয় আর কেউ ছিল না। অজস্র স্ত্রী ও দেড়শোজনের ওপর ছেলেমেয়ে নিয়ে উনি সাতষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন। প্রথমেই চোখে পড়ে প্রকাণ্ড উঁচু চারটে র‍্যামসির বসা মূর্তি। ওনার হাঁটুর নীচে ওনার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী নাফারতরি ও ফ্যারোর প্রথম দিকের কিছু সন্তানের মূর্তি। উঁচু পিলার এই মূর্তিগুলোকে সাপোর্ট করছে তাই সব সমেত এদের উচ্চতা একত্রিশ মিটার। প্রতিটি মানুষকে এই স্ট্যাচুগুলোর তলায় এতটাই ক্ষুদ্র ও নগণ্য লাগছিল যেন সাড়ে তিন হাজার বছর বাদেও র‍্যাম্সি বুঝিয়ে দিচ্ছে তার স্ট্যাটাস্। নূবিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে

উনি এই মন্দিরটি বানান। তাই ভেতরে ঢুকে দেখলাম চতুর্দিকেই ওনার কীর্তি কাহিনী আঁকা আছে। একটা ছবিতে দেখলাম র‍্যাম্সি নূবিয়ানদের চুলের মুঠি ধরে কচুকাটা করছেন। এখন অবশ্য ঐতিহাসিকরা বলেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নাকি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উলটো ছিল অর্থাৎ র‍্যাম্সিই নূবিয়ান ও টার্কির হিটাইটদের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতেন একেই বলে প্রোগোগাণ্ডা। এই মন্দিরটিকে এমনভাবে বানানো হয়েছিল যে বছরে দুবার অর্থাৎ বাইশে ফেব্রুয়ারী ও বাইশে অক্টোবর সূর্যের আলো এই ঘরের অন্ধকার ভেদ করে সোজাসুজি র‍্যাম্সির মুখে গিয়ে যেন পড়ে। এই দুদিনের মধ্যে একদিন ওনার জন্মদিন আর অন্যদিন উনি রাজত্ব পেয়েছিলেন। হাজার হাজার বছর আগের ইজিপসিয়ানদের ইঞ্জিনিয়ারিং ও অ্যাস্ট্রোনমির জ্ঞানের পরিধি দেখে আজও যেন বাক্‌রোধ হয়ে যায়। তাই তারা কিভাবে এতসব অসাধ্য সাধন করেছিলেন সেই গবেষণায় না গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমিও মনে মনে বলে উঠলাম '-সিন্ধুরে তাকায়ে দেখো, মরিও না সেঁচে।'

আবুসিম্বল্‌মকে বিদায় জানিয়ে আবার লক্সরে ফিরে এলাম, পরের দিনের গন্তব্যস্থল ছিল লাক্সারের কাছেই 'ভ্যালি অফ্ দ্য কিং'। নীল নদের কাছে এই পাহাড়ি উপত্যকাটি ছিল তখনকার ফ্যারোদের সমাধিস্থল। মিশরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনে এতটাই বিশ্বাসী ছিল যে, মৃত ফ্যারোদের মমির সাথে অজস্র জিনিসপত্র, সোনাদানা, খাবার সবই ঘরের ভেতরে পুরে দিত। দৈনন্দিন জীবনে ফ্যারোর যা লাগতে পারে সে সব জিনিসপত্র এই ঘরগুলিতে রেখে বাইরে থেকে সিল করে দেওয়া হত। ফ্যারো মারা যাবার পর চল্লিশ দিন ধরে পুরো শরীরটাকে নুনে ঢেকে সব জলীয় বাষ্প বার করে শুকনো শরীরটিকে সুগন্ধ তেল ও মশলা মাখিয়ে সাদা ফিতে দিয়ে আপাদ মস্তক মুড়িয়ে দিত অবশ্য তার আগেই হার্ট বাদ দিয়ে শরীরের সমস্ত অর্গানগুলিকে আলাদা জারে নুনজলে ভিজিয়ে রাখার চল ছিল। সব দেখে ফ্যারোর মুখের সাথে মিল রেখে সোনার মুখোস দিয়ে মুখটাকে ঢেকে মমির কফিনে শুইয়ে দেওয়া হত। তুতেন খামেনের চেম্বার বাদ দিলে আর কোনওটাই চোরেদের কবল থেকে রক্ষা পায়নি। র‍্যাম্সি বা হাটশেপসুট্-এর মত শক্তিশালী কয়েকজন ফ্যারোর মমি অক্ষত অবস্থাতে পাওয়া গেলেও তাদের সাথে পুঁতা ধনসম্পত্তি সবই অদৃশ্য হয়ে যায়। এই বিশাল পাথুরে ভূখণ্ডে হাওয়ার্ড কার্টার কিভাবে তুতেন খামেনের সমাধি আবিষ্কার করেছিলেন তা ভগবানই জানেন অর্থাৎ সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে চোরে যা পারেনি উনি তাই পেরেছিলেন। আমরা অনেক চেম্বারেই ঢুকতে পারিনি, কারণ মানুষের নিশ্বাসে পেষ্টিং নাকি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর কাছেই আর একটি দর্শনীয় স্থান হল ইতিহাসের সব থেকে পরিচিত মহিলা ফ্যারো 'হাটসেপ্‌সুট'-এর মন্দির। স্বামী টাট্‌মোস মারা গেলে খৃষ্টপূর্ব চোদ্দশো ঊনআশিতে উনি নিজেই নিজেকে ফ্যারো বলে ঘোষণা করে সিংহাসনে বসে যান। শুধু তাই নয় পাছে লোকে মহিলা বলে না মানে উনি নকল দাড়ি লাগিয়ে ছেলেদের মত পোষাক পরে প্রায় বাইশ বছর রাজত্ব চালিয়ে গেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের ভিত্তিতে এত টাকা করেছিলেন যে তার নিদর্শন স্বরূপ বহু স্মারক স্তম্ভ উনি ইজিপ্টের বহু জায়গায় রেখে গেছেন। তবে সব থেকে সুন্দর হল আমুন দেবতার নামে উৎসর্গ করা এই মন্দির। সারি সারি পিলার দেওয়া তিনটে স্তরে তৈরী এই মন্দিরটি এখনও এত সুন্দরভাবে রাখা আছে যে কে বলবে এর বয়স সাড়ে তিন হাজার বছর। শোনা

যায় এই সাতানব্বই ফিট উঁচু মন্দিরটির প্রতিটি স্তরই সুন্দর স্ট্যাচু ও ফুল গাছ দিয়ে সাজানো থাকত তাই প্রাচীন মিশরে এটি এক অতুলনীয় মন্দির বলে খ্যাত ছিল।

লাক্সার থেকে আবার কায়রোতে ফিরে এলাম, কারণ পরের দিন রাতেই ইজিপ্ট ছেড়ে যাওয়ার পালা। কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছিল হয়ত আমি আর কোনওদিন ইজিপ্ট আসবো না। তাই শেষবারের মত আর একবার স্পিংস্ ও পিরামিডকে দেখে আসি। তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল কত ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে সাড়ে চার হাজার বছর ধরে এরা দাঁড়িয়ে আছে যাদের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট', 'জ্যুলিয়াস সীজার' ও 'নেপোলিয়ান বোনাপার্টে'র মত যোদ্ধারাও হয়ত কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ ভুলে আমার মত অবাক হয়ে তাকিয়ে ভেবেছিল কি করে অত বছর আগে মানুষে এই অসাধ্য সাধন করেছিল?

ইজিপ্ট ছাড়ার সময় হয়ে এল কিন্তু মনের কোণে এই পিরামিড, স্পিংস্, আবুসিম্বল ও কর্ণাক টেম্পিল এমন একটা জায়গা করে নিল যে আজও তাদের স্মৃতিচারণ করতে গেলে মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। মনে আছে বিদায় নেবার আগে প্রাচীন মিশরের সেই সব না দেখা নাম না জানা ইঞ্জিনিয়ার, ভাস্কর ও স্থপতিদের উদ্দেশ্যে মনে মনে সেলাম ঠুকে বলে এসেছিলাম- 'জিতা রহ তুমারি কাম'।

একটি বাস্তব কাহিনী

মায়ের কান্না

মোহাঃ নুরুল ইসলাম মিয়া

অন্য কোনো অনুভূতি থাক বা না থাক, নিজের বাচ্চাদের প্রতি পশু-পাখী, জীব-জন্তুদের যে অনুভূতি দয়া-মায়া অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় তা মানুষকেও হার মানিয়ে দেয়। এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষের মতো তারাও নিজের বাচ্চাদের স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা দিয়ে বুকে আগলে রেখে বড়ো করে তোলে। বিপদের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে বাচ্চাদের বাঁচানোর ঝুঁকি নিয়ে থাকে।

সালটা ছিল ২০১৩। হঠাৎ একদিন আমার বাড়ির বাইরে একটা কুকুরকে বসে থাকতে দেখি। কেউ তার সামনের একটি পা কেটে দিয়েছে। লাল হয়ে আছে, হাল্কা রক্ত ঝরছে আর সে মুখ দিয়ে চাঁটছে। তাকে খুব অসহায় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কোথাও তাড়া খেয়ে এখানে জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করছে। পশু-পাখীর প্রতি আমার বড়ো ছেলের ঝোঁকটা খুব বেশি। কোনো আহত পাখী দেখলে বা পাখীর ছানা পেলে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা, খাওয়ানো, সেবা-যত্ন করা, পড়া বাদ দিয়ে সে সব কাজ করতেই ব্যস্ত থাকে বেশি। স্বাভাবিকভাবে কুকুরটাকে দেখে তাকে কিছুটা খাবার এনে দিল। তারপর থেকে সে আমার বাড়ির বাইরে থাকতে শুরু করল। সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যার সময় এসে হাজির হয়ে যায়। সারা রাত বাড়ির বাইরে থাকে। এইভাবে চলতে থাকে।

বেশ কিছু দিন পার হয়ে গেছে। তার স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবং তার পেটে বাচ্চাও এসেছে। কাজেই খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হল। যখন বাচ্চা প্রসব করার সময় হল, সে নিরাপদ জায়গা খুঁজতে শুরু করল। প্রথমে আমার বাড়িতে চালার ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল। যে কোনো কারণেই হোক না কেন তাকে জায়গা দেওয়া হল না। আমারই বাড়ির উত্তর দিকে অপরের একটি জায়গা ইটের ছোটো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, ধারে ধারে আছে কিছু নারকেল গাছ। সেখানে একটি কোণে কিছু কাঁটার ডাল জমা করা ছিল যেটা দেখতে অনেকটা ঝোপের মত। অন্য কোথাও নিরাপদ জায়গা বোধ হয় সে পায় নি, তাই সে ঝোপটাকে বেছে নিয়ে ওরই মধ্যে তিনটি বাচ্চাকে পৃথিবীর আলো দেখালো। এখন সে আর সাধারণ কুকুর নয়। এখন সে তিন তিনটি সন্তানের মা। সন্তানদের দেখাশোনা করা, খাওয়ানো, যত্ন করা, সারা রাত্রি পাহারা দেওয়া সব দায়িত্ব মা দিন-রাত ধরে নিষ্ঠার সাথে পালন করতে থাকে।

সময়টা সম্ভবত আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ হবে। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। সে সময়টা কেন ডাইরীতে লিখে রাখিনি আজও মনে আফশোস হয়। মনে পড়ে, সেই দিনটার কথা। সারারাত্রি ধরে বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঘরে শুয়ে শুয়ে শুনছি ওই তিনটি সন্তানের মায়ের আর্তনাদ। চিৎকার নয়, সারারাত্রি ধরে কেঁদে চলেছে। রাত্রে বুঝতে পারিনি তার কান্নার কারণ। ভেবেছি, হয়ত শেয়ালে তার বুক খালি করে বাচ্চাগুলিকে নিয়ে গেছে।

সকালে উঠে জানালা খুলে দেখছি কুকুরটা চিৎকার করছে। একবার নারকেল গাছের নীচে দৌড়ে যাচ্ছে, আবার ছুটে আসছে ওই ঝোপের কাছে। ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেমন ছোটো প্রাচীরটার কাছে গেছি ও আমার দিকে মুখ তুলে মানুষের মত কাঁদতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছি না কী ঘটেছে।

একটু দূর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতেই পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল। বাচ্চাগুলিকে শেয়ালে নিয়ে যায়নি। বাচ্চাগুলির জীবন বিপন্ন, ঝোপের মধ্যে তারা জল-কাদায় ছটফট করছে। তাই মা তার অসহায় বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য এই চারিদিক ঘেরা জায়গার মধ্যে একটু দূরে নারকেল গাছের নীচে যেখানে পাতার নীচে জল কম পড়ছে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সারারাত ধরে চেষ্টা করেছে। কখনও দূর হতে বাচ্চাদের ডেকেছে, কখনও ঝোপের কাছে এসে বাচ্চাদের ডেকেছে। তাদের জীবন বিপন্ন দেখে উদ্ধার করার জন্য মা সারারাত্রি ধরে দৌড়াদৌড়ি করেছে ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। তারা বেরিয়ে আসবে কী করে, মাত্র ৭/৮ দিনের বাচ্চা। মা-ই কেন তার বাচ্চাদের মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে না, সেটা বোঝা গেল না।

তবে বোঝা গেল যে, সন্তানদের জীবন রক্ষার জন্য তার এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও করুণ আর্তনাদ। ভাবলাম, যে ভাবেই হোক বাচ্চাগুলোকে নিরাপদ জায়গায় তুলে আনতে হবে। ভয় হচ্ছে, যদি কামড়ে দেয়।

বুখারী শরীফের মধ্যে দেখা যায় — আল্লাহ্ তাআলা এক পতিতার পাপ মাফ করেছিলেন, কারণ সে পিপাসায় মৃতপ্রায় এক কুকুরকে বাঁচানোর জন্য কূপ থেকে পানি তুলেছিলেন।

তাই, পশু-পাখী যাই হোক না কেন, এই করুণ অবস্থা তো চোখে দেখা যায় না। তাই মাথায় ছাতা নিয়ে হাতে একটি ঝুড়ি নিলাম। বাড়ি থেকে আবর্জনা তোলা প্লাসটিকের হাতা আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল, যাতে আমি বাচ্চাগুলোকে হাতে করে না তুলি। সহযোগী আমার দুই পুত্র।

আস্তে আস্তে বেড়া খুলে ভিতরে প্রবেশ করছি আর কুকুরটির গতিবিধি লক্ষ্য করছি। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার হাতে ঝুড়ি ও হাতা দেখে মায়ের কান্না থেমে গেল। সে এক মুহূর্তেই বুঝে গেল তার বাচ্চাদের জীবন রক্ষার জন্য আমি এই প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে যুদ্ধ করে চলেছি। তার বাচ্চাদের কাছে আসতেই সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ঝোপের মধ্যে হাত বাড়াচ্ছি আর তার দিকে লক্ষ্য করছি আর ভাবছি, যদি সে ভাবে যে, আমি তার বাচ্চাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছি, তাহলে তো সে হিংস্র হয়ে উঠবে আর আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেখলাম, সে ঠাণ্ডা মেজাজে চুপচাপ আমার তিন হাত দূরত্বে বসে আছে। আস্তে আস্তে তিনটে বাচ্চাকে বের করে ঝুড়ির মধ্যে রাখলাম। কোনো রকমে ছাতাটা ঘাড়ে আঁটকে বাচ্চাগুলি নিয়ে হেঁটে চলেছি বেড়ার বাইরে আর বাচ্চাদের মমতাময়ী মা ও আমার পিছন পিছন হেঁটে চলেছে।

সেখান থেকে তুলে এনে বাড়ির সামনে সামান্য একটি উঁচু জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করলাম এবং বাড়িতে যে পলিথিন ছিল তাই দিয়ে উপরে ছাউনী দিলাম যাতে বৃষ্টির জল না পড়ে। মনে স্বস্তি এল, আর কোনো সমস্যা নেই।

বাড়ি এসে ভেজা জামা-কাপড় ছেড়ে শুকনো জামা-কাপড় পরার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় আবার তার চিৎকার ভেসে এলো। ভাবলাম, আবার কী হল। বাড়ি থেকে বের হলাম। কাছে গিয়ে দেখি, বাচ্চাগুলো যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে জল জমছে। সে চিৎকার করছে আর ভালো জায়গা খোঁজার চেষ্টা করছে। পাশের বাড়িতে গলির ভিতরে বেশ কিছুটা উঁচু একটা জায়গাকে নিরাপদ ভেবে সে একটু খাল করে সেখানে যাবার জন্য বাচ্চাদের ডাকছে, সেখানে জল পড়ছে না ঠিকই কিন্তু বাচ্চারা যাবে কী করে? প্রথমে ভাবলাম, তার পছন্দ করা জায়গাটাতে বাচ্চাগুলোকে রেখে আসি। কিন্তু ভয় হল, বাচ্চাগুলো ঝড় বৃষ্টি থেকে নিরাপদ হলেও শেয়াল থেকে কখনোই নিরাপদ নয়।

অবশেষে আমার এক প্রতিবেশী, নাম নূর মহম্মদ, তাকে ডেকে নিয়ে দুজনে যুক্তি করতে লাগলাম, কী করা যায়। ঠিক হল, প্রথমে ইট দিয়ে তার উপর কাঠের তক্তা দিয়ে তার উপর বাচ্চাগুলোকে রাখতে হবে। তাই করা হল, ইটগুলিকে সাজিয়ে তার উপর কাঠের একটি তগু্া রেখে আমরা দুজনে অতি সযত্নে বাচ্চাগুলিকে উপরে তুলে দিলাম। উপরে পলিথিনি দিয়ে ছাউনি করে দিলাম ঠিক তাঁবুর মত। এইসব কাজ করার সময় দুর্যোগ কিন্তু থেমে থাকেনি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কুকুরটি সব সময় আমাদের পাশে বসে সমস্ত কাজকর্ম এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে, এক মুহূর্তের জন্য সে অন্য কোথাও সরে যায় নি আর মুখ দিয়ে সে কোনো আওয়াজও বের করেনি। যাই হোক, পলিথিন যথেষ্ট না থাকার ফলে বাচ্চাগুলিকে পাশ থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে। কী করা যায়।

সকাল সাতটা বাজছে, অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, জোরে বাতাস বইছে। পলিথিন কেনার জন্য মাথায় ছাতা দিয়ে সারগাছি বাজারে এলাম। দেখলাম, দোকান বন্ধ। বাধ্য হয়ে দোকানদারকে বাড়ি থেকে ডেকে প্রায় ১৪০ টাকার পলিথিন কিনে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাতাসে ছাতা এদিকে ওদিক করছে, বৃষ্টির ঝাপটায় লুঙগী, জামা ভিজে যাচ্ছে। বাড়ি এসে পলিথিন দিয়ে ভালো করে ছাউনী করে দিলাম আর চারি দিক এমনভাবে ঘিরে দিলাম যাতে বৃষ্টি ও বাতাসের ঝাপটা না লাগে আর শেয়ালও যেন বুঝতে না পারে।

এরপর মায়ের কান্না একেবারে থেমে গেল। চিৎকার নয়, কান্না নয়, এখন সে পাহারা দিতে থাকে তাঁবুর বাইরে থেকে। সেদিন বুঝেছি, মা কাকে বলে, মা কেমন হওয়া উচিৎ, মাকে কত বড়ো দায়িত্ব পালন করতে হয়। বাচ্চাদের যত্ন করা, খাওয়ানো, বাচ্চাদের সাথে খেলা করা, বুকে আগলে রাখা - মানুষের থেকে সেও কোনো অংশে কম নয়। মানুষের ক্ষেত্রেও আবার সব মা সমান নয়। কোনো কোনো মা বিশ্বাসঘাতকতা করে তার সন্তানদের সঙেগ। সুখের আশায় নিজের কচি কচি বাচ্চাদের ফেলে চলে যায় অন্যের সাথে যা দেখে পশুরাও লজ্জা পায়।

প্রায় এক মাস কেটে গেল। বাচ্চারা এখন খেলা করে, ঘুরে বেড়ায়। বাচ্চাগুলি সেই দুর্যোগের রাত্রিতে রক্ষা পেলেও পরে তিনটি বাচ্চার মধ্যে দুটি বাচ্চা আর তার মা অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

এটা সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাসের ঘটনা। আমার বাড়ি সারগাছি বাসস্ট্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ দিকে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পূর্ব পাশে। আমি বেলডাঙ্গা এসে মাদ্রাসার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, হঠাৎ টেলিফোনে খবর এল একটি বাচ্চা- যেটা মোটাসোটা ও দেখতে খুব সুন্দর ছিল, লরীর ধাক্কায় মারা গেছে। অফিসের সব কাজ বন্ধ করে তখনই ট্রেকারে চেপে ছুটে আসি। দেখলাম, এক করুণ দৃশ্য। রাস্তার ধারে পড়ে আছে বাচ্চাটির নিথর দেহ আর তার মা মৃত দেহের পাশে বসে পাহারা দিচ্ছে। বাচ্চাটিকে দেখে মনে হচ্ছে, এই বুঝি সে আমাকে দেখে উঠে আসবে।

বাড়িতে কুকুর রাখলে যেহেতু রহমতের ফেরেশতা বাড়িতে প্রবেশ করে না, তাই বাড়ির ভিতরে তাদেরকে জায়গা দেবার সাহস করিনি। কিন্তু বাইরে গেলেই বাচ্চাগুলি ছুটে আসত। মাদ্রাসা যাওয়ার সময় পিছু পিছু দৌড়াতো। পায়ের কাছে গড়াগড়ি করার চেষ্টা করত। কাপড়ে ছোঁয়া লাগার ভয়ে ছুটে পালাতাম।

বাচ্চাটাকে মাটি চাপা দিতে হবে। একটা কোদাল নিয়ে নিজেই রাস্তার পাশেই একটু নীচে খাল করে বাচ্চাটিকে মাটি চাপা দিলাম। লক্ষ্য করেছি, বাচ্চাটার নিথর দেহ যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে গিয়ে তার মা প্রায়ই তার খোঁজ করত। তার আরোও কিছুদিন পরে আর একটা বাচ্চা রাস্তায় চাপা পড়ে। আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমি আসার আগেই তাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

এখন রইল মা আর তার একটি মাত্র দুধের বাচ্চা। মা প্রায় নিয়মিত বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে যায়, আদর করে যায়। কখনও আনমোনা হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় আর হারিয়ে যাওয়া দুটি বাচ্চাকে খুঁজতে থাকে। কখনও আকাশের দিকে মুখ তুলে চায়, কী যেন বলতে চায়। এভাবে কিছু দিন কেটে যায়।

হঠাৎ একদিন বাচ্চাটির ভাগ্যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। একদিন ভোর বেলায় দেখা গেল, রাস্তার ধারে পড়ে আছে তার মায়ের মৃতদেহ। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কেউ বলছে, লরীর ধাক্কায় মারা গেছে, কেউ বলছে, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমার স্কুল যাবার সময় হয়েছে, তাই একটা লেবারকে ডেকে এনে ১০০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, তার মৃতদেহ যেন তার দুই বাচ্চার পাশে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

মা ছিল তার একমাত্র আশ্রয়। স্বাভাবিকভাবে মায়ের জীবন শেষ হবার পর বাচ্চাটি বড়ো অসহায়। কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কে খাওয়াবে, কী খাবে? তার উপর শেয়ালে ধরার ভয় তো আছেই। আমার বাড়ীর পাশে এক প্রতিবেশীর দোকানে বেঞ্চের নীচে সে আশ্রয় নিয়ে সেখানে থাকতে শুরু করে। সে দুধ ছাড়া কিছু খেতে পারে না। বাড়িতে চা কফি খাওয়ার জন্য এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রসূলের কাছে এসে হাজির হল। তার শরীরে ছিল একটি চাদর এবং তার হাতে কিছু ছিল যা ঢাকা ছিল। সে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় কতকগুলো ছোটো ছোটো পাখীর ছানার শব্দ

শুনতে পেলাম। তারপর তাদেরকে ধরে এনে চাদরের উপর রাখলাম। তাদের মা আমার মাথার উপরে ব্যাকুলভাবে উড়তে লাগল। আমি চাদরের কোণা খুলে দিলাম। তাদের মা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইগুলি হল সেই ছানা। আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বললেন, এদের ছেড়ে দাও। সে তাই করল। তাদের মা তাদেরকে আগলে রাখল।

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বললেন, তোমরা কি এই ছানাগুলোর প্রতি তাদের মায়ের মায়া-মমতা দেখে আশ্চর্য বোধ কর? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর শপথ ঃ এই ছানাগুলির প্রতি তাদের মায়ের মায়া-মমতা যে রকম, সৃষ্টি জীবের প্রতি আল্লাহ্‌র মায়া-মমতা তার চেয়েও বেশি। অতএব যেখান থেকে তাদের এনেছ, সেখানে তাদের রেখে এসো। তাদের মাকে তাদের সঙ্গে থাকতে দাও (মিশকাত শরীফ, বাবুল ইস্তেগফার ওয়াত্ তওবাহ্)।

পরপারে মুক্তি পেতে আল্লাহ্‌র রহমতই একমাত্র ভরসা। পৃথিবীতে যেটুকু কাজ করেছি তার চেয়েও অনেক অনেক গুণ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছি জেনে, শুনে, বুঝে ও ভুলে। কাজেই মুক্তি পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, তবুও তাকিয়ে আছি আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে।

যাক্ সে কথা, ফিরে আসি আমার বাড়ির বাইরে বসে থাকা মমতাময়ী মায়ের কথায়, যার তিন তিনটে সন্তানের প্রতি মায়া-মমতা, নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝড় বৃষ্টির রাত্রিতে তাদেরকে বাঁচানোর যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও করুণ আর্তনাদ আজও ভুলতে পারিনি। শুধু মনে হয়, মানুষের মত পশু-পাখী, জীব-জন্তুদের হৃদয়ে মহান স্রষ্টা যদি সন্তানের প্রতি এই মায়া-মমতা না দিতেন, তাহলে এই পৃথিবীতে মানুষের পাশাপাশি তাদের গতি অব্যাহত থাকত না আর এই পৃথিবী এত সুন্দর হয়েও উঠত না।

রম্যরচনা

সাম্রাজ্যের ওপারে

সৌরভ হোসেন

সেই রাজাও নেই সেই রাজত্বও নেই। সত্যিই কি তাই ? নাকি রাজা কেবলমাত্র পোশাক বদলেছেন মাত্র ? অর্থাৎ নতুন বোতলে পুরোনো মদ ! জমিদার-জোদদার সত্যিই কি আজ দেওয়াল লিখন ? নাকি শুধু মুখোসের অদল-বদল ঘটেছে এই যা ? আচ্ছা ভালো করে চোখ কান খুলে হাঁটুন তো, পাই টু পাই খেয়াল করুন---কি, দেখা যাচ্ছে ? রাজা-জমিদার-সম্রাটদের আনাগোনা ? অবশ্য কিছুক্ষণ আপনাদের চোখ থেকে ভোট ভোট ভ্যাট ভ্যাট ভটাম ভটাম দূর করতে হবে। তবেই রাজা দর্শন হবে। না হলে শুধু ভদ্রের আলখাল্লাই চোখে সুঁজবে। অথচ খোলসের ভেতরের হাড়-গোড়টা দেখা বড্ড জরুরি। আসলে আপনারা দূরবীক্ষণে দেখতে পান না পান, অনুবীক্ষণে দেখতে পান না পান-- যাঁদের জন্য গলা ফাটান, যাঁদের জন্য বোমা বাঁধেন, যাঁদের জন্য রাজপথে ভীড় করেন - তাঁরাই সে যুগের রাজারাজরা আর এ যুগের....। আর খুলে নাইই বা বললাম। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ? অর্থাৎ "লাঙল যার জমি তার" অথবা "আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম" -এর ভারতবর্ষেও তাঁরা এক একজন রাজা, নবাব অথবা সম্রাট। শুধুমাত্র রাজপ্রাসাদের (বসতবাটি!) স্থাপত্যের নকশার কারুকার্যের পরিবর্তন ঘটেছে এই যা। আপনাকে একটা দায়িত্ব দিলাম। ঘেঁটে দেখবেন কি ? এই যে যাঁরা একসময় এদেশের রাজা সম্রাট ছিলেন, তাঁদের পরিবার পরিজন এখন কোথায় ? কী করছেন ? জাতীয় সড়ক ধরে হাঁটা ধরুন। ঠিক দেখতে পাবেন কে কোথায় ব-কলমে সুলতানগিরি করছেন। এসব চেনার জন্য অবশ্য কোন প্রথিতযশা প্রত্নতাত্তিক বা ইতিহাসবত্তা হওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু আবরণের ভেতরের আভরণটা দেখবেন, ব্যস, তাহলেই হল। আচ্ছা আর একটা ব্যাপার বলুন তো ? ইতিহাস শুধু শাসকদেরই কেন লেখা হয় ? প্রজারা কোয়ান্টাম থিয়োরি আবিষ্কার করলেও তাঁদের হাঁড়ির খবরও কেউ রাখেন নি ! বেটা-বিটির কথা তো ছেড়েই দিলাম। জানেন ? একটা জিনিস জানার জন্যে বহুদিন ধরে আমার ভেতরটা খুঁত খুঁত করে। আচ্ছা, কুন ব্যাটা প্রথম "আগুন" আবিষ্কার করেছিলেন ? অথবা কুন লোকটা প্রথম গড়িয়েছিলেন- "চাকা" ? নিশ্চয়ই তাঁরা কোনো রাজা-রানি ছিলেন না ? থাকলে.....গা চুলকানো ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকতো না ! আচ্ছা, বলুন তো ? আজ সেই রাজা না থাকলে, সেই রাজত্ব না থাকলে প্রতিদিন এত এত উলুখাগড়ার প্রাণ যাচ্ছে কেন ? একটু ভাববেন কি ? আপনারা ভাবুন, ততক্ষণে আমি "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক", "আমেরিকার কালো হাত ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও" অথবা "গরিবী হটাও"...এই গোছের কিছু স্লোগান লিখে নিয়ে আসি। আরে বাবা, গলা তো ফাটাতে হবে ? দু-টাকা কিলো দরে চালটা কি মাগনা দিবে ?

কবি/লেখক পরিচিতি

(বর্তমান বাসস্থান)

অর্চনা মিত্র – বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
আখতার মাহমুদ - ঢাকা, বাংলাদেশ
আবু রাশেদ পলাশ - শেরপুর, বাংলাদেশ
ঋষি – আর. গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগণা
এ এম আলম - ত্রিমোহিনী, মুর্শিদাবাদ
কবিরুল ইসলাম কঙ্ক - দেবকুন্ডু, মুর্শিদাবাদ
কৌশিক বিশ্বাস - বাসুদেবপুর, হাওড়া
খুসবু আহম্মেদ – হরিহরপাড়া,মুর্শিদাবাদ
গার্গী মুখার্জী - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
জৈদুল সেখ – জীবন্তি, মুর্শিদাবাদ
দীননাথ মণ্ডল - মির্জাপুর, বেলডাঙ্গা,মুর্শিদাবাদ
দীপঙ্কর বেরা – ১৯৩ আন্দুল রোড, হাওড়া
দেবকুমার দাস – মানকর, বর্ধমান
দেবব্রত সরকার – বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
দেবাশীষ মন্ডল – খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
নরেশ মণ্ডল - বেলেঘাটা, কলকাতা
নীলাক্ষী চ্যাটার্জী - রানিগঞ্জ, বর্ধমান
নুরজামান শাহ - লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
পলাশ ব্যানার্জী - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় - উত্তরপাড়া, কলকাতা
বিশ্বজিৎ মণ্ডল - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
মনিরুদ্দিন খান – বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
মুরারি – কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া
মোহাঃ নুরুল ইসলাম মিয়া- সারগাছি,মুর্শিদাবাদ
যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস – জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
রাজকুমার শেখ – বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
লতিফা ইয়াসমিন সুইটি – রংপুর, বাংলাদেশ
শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় – বেদিয়াপাড়া, কলকাতা
শ্রাবণী ব্যানার্জী – নিউ জার্সি, আমেরিকা
সঞ্জয় আচার্য – সিলেট, বাংলাদেশ
সুজয় মণ্ডল - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
সুদীপ্ত বিশ্বাস -
সুপর্ণা দাস - ইংলিশবাজার, মালদা
সেখ মোজাম্মিল - সরুলিয়া, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
সেলিম জাহাঙ্গীর - মহলন্দি, কান্দি, মুর্শিদাবাদ
সৌরভ হোসেন- দস্তর পাড়া, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ
স্বপন ব্যানার্জী পূর্ণপাত্র - কলকাতা

ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ

Historical Murshidabad

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাসের তথ্য ও ভ্রমণের উপযুক্ত গাইড পেতে এই ওয়েবসাইট দেখুন।

Website : www.historicalmurshidabad.com